ডিসেম্বর ২০২৪ ■ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩১

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

জাকোয়াত হোসেন, অষ্টম শ্রেণি, সরুপচন্দ্র পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ

মো. রায়ান কামাল, নবম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, তোমরা জানো ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের মহান বিজয় দিবস। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন বাংলাদেশ। পেয়েছি লাল-সবুজ পতাকা। এই মহান বিজয়ের গৌরবের সঙ্গে মিশে আছে যেমন আনন্দ, তেমনই আছে আত্মত্যাগের ইতিহাস। এ মাসেই আমরা হারিয়েছি আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদেরও। তাই এই দিনে আমরা পরম শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় স্মরণ করি সকল বীর শহিদদের।

বাংলাদেশে এখন শীতকাল। কুয়াশার চাদর মুড়িয়ে আসে শীতের সকাল। মৌমাছির গুঞ্জনে মুখরিত হয় হলুদ সরষে ক্ষেত আর ফুলের বাগান। দেখা মিলে হরেক রকমের সবজির। এছাড়া খেজুরের রস দিয়ে বানানো হয় নানা রকম পিঠাপুলি। বাড়িতে বাড়িতে পাওয়া যায় নতুন ধানের নানান স্বাদের পিঠাপুলির গন্ধও।

আমরা এ বছর গৌরবময় বিজয়ের ৫৩ বছর উদযাপন করছি। নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, ছড়া ও আঁকা ছবি নিয়ে সাজানো হলো নবারুণ বিজয় দিবস সংখ্যা। তোমরা তোমাদের প্রিয় পত্রিকায় নিয়মিত লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাবে। আর এই সংখ্যাটি কেমন লাগল জানিও। সবাই ভালো থেকো।

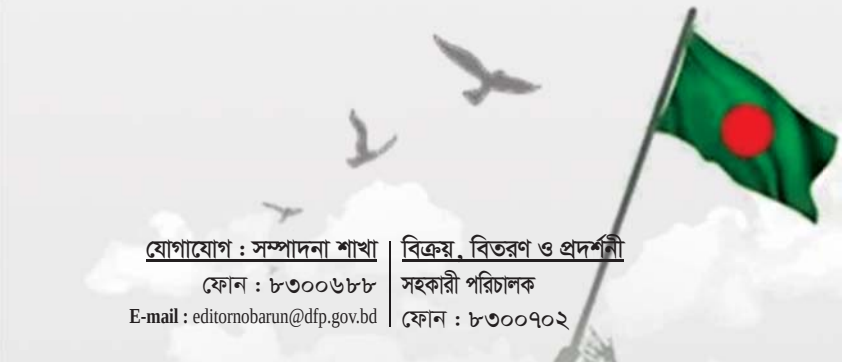

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৭০২

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
রিফাত জাফরীন

সম্পাদক
ইসরাত জাহান

সিনিয়র সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহসম্পাদক
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

সূচি

নিবন্ধ

৪ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ/ তারিক মনজুর
৫২ বাঙালির ঐতিহ্যে পিঠা/ সানজানা রুপা
৫৪ খেলার সময় শেখা/ মো. মুনছুর আহমেদ
৫৭ শীতের খেলা ব্যাডমিন্টন/ রওশন জাহান রত্না

গল্প

৮ অপারেশন বাগোয়ান/ দীপু মাহমুদ
১৪ মুক্তিযোদ্ধা হাড়গিলা/ আশিক মুস্তাফা
১৬ দাদুর মুক্তিযুদ্ধ/ এম. আতিকুল ইসলাম
২২ কিশোর কিরণ/ মুহসীন মোসাদ্দেক
২৬ মুক্তির সুখ/ নাসরীন খান
৩০ মুক্তিযোদ্ধা দাদু/ আলমগীর কবির
৩৪ বিজয়ের এই দিনে/ মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন
৩৮ কিশোর যোদ্ধা/ সুজন সাজু
৪১ মুক্ত ময়না/ মাশ্‌হুদা মাধবী
৪৬ মুক্তিযোদ্ধার গল্প/মাহমুদুল হাসান খোকন

প্রতিবেদন

৫০ প্রাণীদের মজার তথ্য/ ফাতেমা আক্তার
৫১ শব্দদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব/ মো. জামাল উদ্দিন
৫৬ বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস/ মাহমুদা কামাল
৫৮ বিবিসির প্রভাবশালী তালিকায় রিক্তা/ জান্নাতে রোজী
৫৯ দশদিগন্ত/ ইমদাদ খান
৬১ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

কবিতাগুচ্ছ

৩ হাসান হাফিজ
১৯ মুসতাফা আনসারী/ নকুল শর্ম্মা
২০ আজহার মাহমুদ/ বিজন বেপারী/ সাফায়েত উল্লাহ
২১ সজীব মালাকার/ আহসানুল হক/ মো. আব্দুস সালাম
২৫ এনামুল কবীর/ তানভির আহমেদ
২৯ মো. জাহিদুর রহমান/ এম. আলমগীর হোসেন
৩৭ সারমিন চৌধুরী

ছোটোদের ছড়া

৩৩ সাবরীনা ইসলাম/ মিহির হোসেন
৪৫ মেহেদী হাসান হৃদয়/ তোহা ইসলাম/ আনোয়ার দিপু

আত্মকাহিনি

১২ মুক্তিযুদ্ধ ও আমার আলাপন/ আবু জাফর আবদুল্লাহ্

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : জাকোয়াত হোসেন/ মো. রায়ান কামাল
তৃতীয় প্রচ্ছদ : মৃন্ময়ী দে/ জেসিকা জেবিন
শেষ প্রচ্ছদ : অনিন্দ্য ঘোষ
৪৯ সিনথিয়া ইসলাম
৬২ আলভিনা চৌধুরী
৬৩ তাহমিনা আলম/ তাছনিম আক্তার শিফা,
৬৪ আরিশা হক/ লায়লা আক্তার

নবারুণ পত্রিকা পড়া ও ডাউনলোড করা যাবে
Nobarun Potrika
www.dfp.gov.bd

রক্তে পাওয়া দেশ

হাসান হাফিজ

আগুন সময় একাত্তর
জনযুদ্ধের রক্ত ঝড়।
তুচ্ছ ছিল প্রাণের ডর
মহান স্মৃতি অনশ্বর।

ন'মাস ধরে যুদ্ধ করে
শত্রু নিধন চিরতরে।
মুক্ত হাওয়ায় প্রাণটি ভরে
স্বাধীনতা পেলাম ঘরে।

গর্বিত কাল, একাত্তর
যোদ্ধারা সব ঝাঁপিয়ে পড়।
শত্রুসেনা খতম কর।
আয়রে ষোলোই ডিসেম্বর।

আগুন জ্বলো বারুদ জ্বলো
মাতৃভূমি মুক্ত হলো–
মায়ের অশ্রু টলোমলো
তুলনা তার কোন্‌টা বলো!

ভুলব না সেই শহিদ স্মৃতি
স্মরণে দেই শ্রদ্ধা প্রীতি।
বিজয় মহান, নতুন রীতি।
নাই উদ্বেগ শঙ্কা ভীতি।

লাল-সবুজে ঋণ অশেষ
রক্তে পাওয়া বাংলাদেশ।

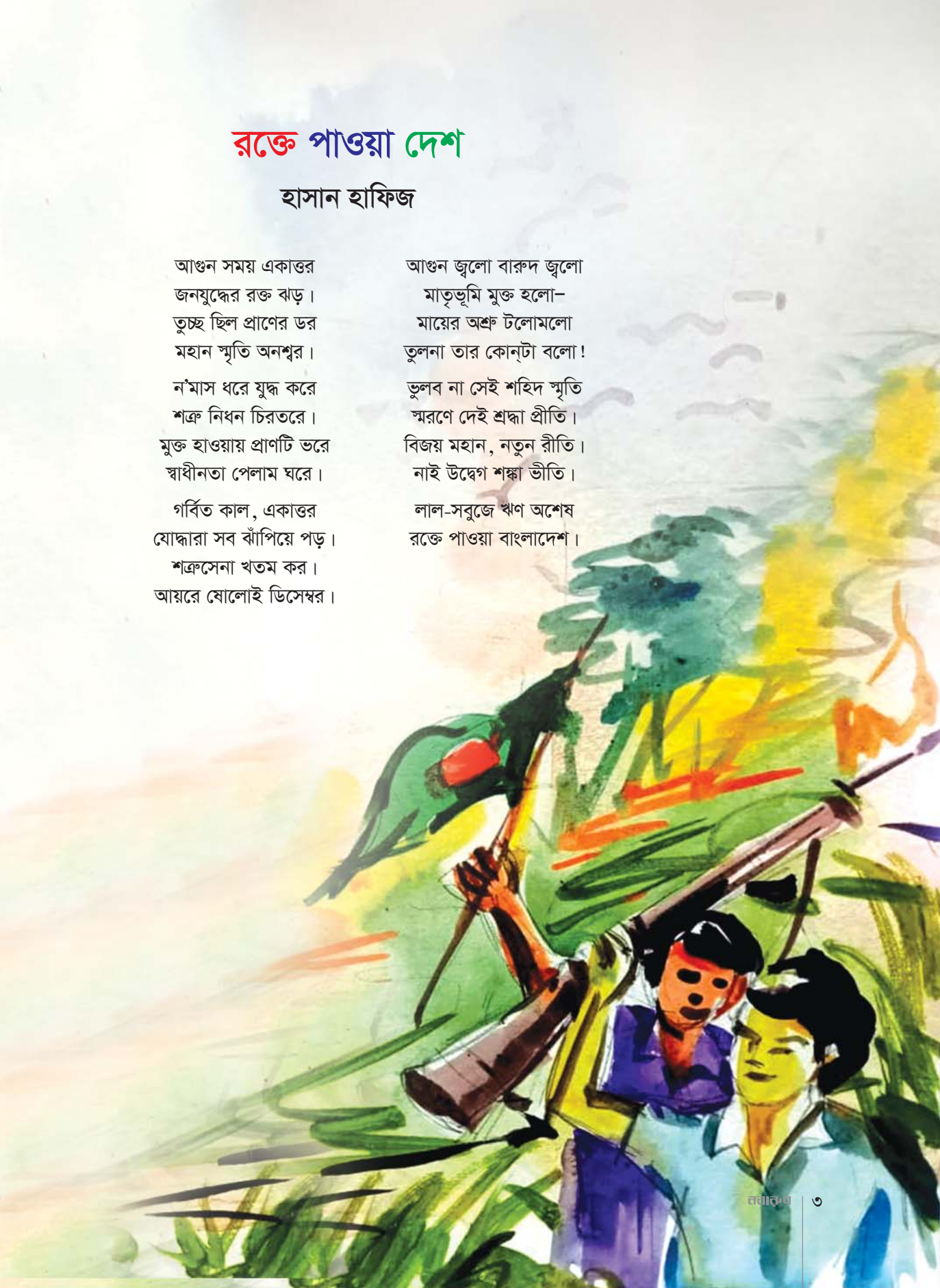

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

তারিক মনজুর

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে। তাই এই দিনটিকে বলা হয় বিজয় দিবস। ২৬শে মার্চ আনুষ্ঠানিক ভাবে আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করি বলে সেদিন আমাদের স্বাধীনতা দিবস। বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রাম কেবল ১৯৭১ সালের যুদ্ধ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে যাকে আমরা যুদ্ধ বলছি, তা আর দশটি সাধারণ যুদ্ধের মতো ছিল না।

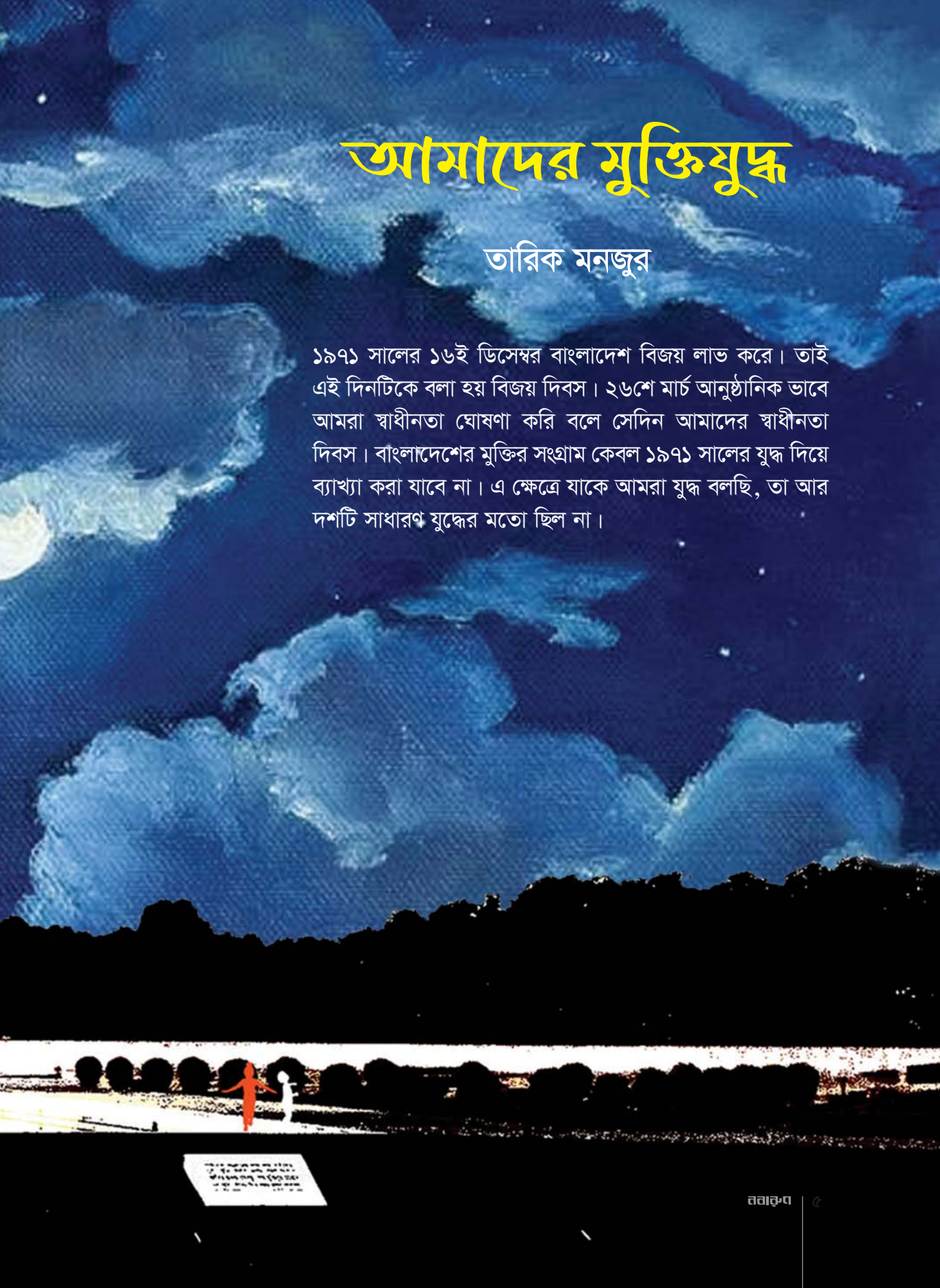

যুদ্ধ বলতে আমরা সাধারণভাবে মনে করি, দুই পক্ষ পরস্পরকে আক্রমণ করবে। যেমন, ১৭৫৭ সালে পলাশির প্রান্তরে যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্য আর নবাব সিরাজউদ্দৌলার সৈন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল। তবে যুদ্ধ যে সবসময় পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণ, তা কিন্তু নয়। অনেক সময় এক পক্ষই শুধু আক্রমণ করতে থাকে। আর অন্য পক্ষ বাঁচার জন্য প্রতিরোধ করতে থাকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল এক পক্ষের আক্রমণ। আমাদের জন্য সেটা ছিল প্রতিরোধ যুদ্ধ। পাকিস্তানি মিলিটারির আক্রমণের জবাবে আমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছি। শত্রুসৈন্য যাতে ট্যাংক, জিপ এসব নিয়ে সামনে যেতে না পারে তাই ব্রিজ ভেঙে দিয়েছি। ট্রান্সফরমার উড়িয়ে দিয়েছি যাতে ওরা বিদ্যুৎ না পায়। সবাই মিলে প্রতিরোধ করেছি বলেই এত বড়ো একটি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জয়ী হতে পেরেছি আমরা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে জনযুদ্ধও বলে। কারণ, এই যুদ্ধে দেশের সব মানুষ সামিল হয়েছিল। বেশির ভাগ যুদ্ধে দেখা যায়, দুই পক্ষের সৈন্যরা শুধু যুদ্ধ করে। সাম্প্রতিক রাশিয়া আর ইউক্রেনের যুদ্ধের কথা ভাবো। সেখানে কিন্তু দেশের সব মানুষ যুদ্ধ করছে না। কেবল সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। এভাবে দু'পক্ষের সেনাবাহিনীর যুদ্ধ এবং তাদের জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে সাধারণভাবে কোনো দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে এ দেশের সব মানুষ অংশ নিয়েছিল। পাকিস্তানি মিলিটারির নৃশংস আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সবাইকে বাধ্য হতে হয়েছে। কেউ অস্ত্র হাতে সরাসরি যুদ্ধ করেছে। কেউ আবার যোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে, খাবার দিয়ে পরোক্ষ যুদ্ধ করেছে। এর মধ্যে তারাই বেশি সাহসী, যারা অস্ত্র হাতে সামনে থেকে যুদ্ধ করেছে। এরাই দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। কারণ তারা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে প্রাণপণ লড়াই করেছে।

অনেক যুদ্ধ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটায়। অতীতে এমন অহরহ দেখা যেত। যেমন, গ্রিক সৈন্যরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে একের পর এক রাজ্য দখল করেছে। গ্রিক বীর আলেকজান্ডার তো ভারত জয় করতেও এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ না করেই ফিরে যান। এভাবে এক রাজা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আরেক রাজ্যে আক্রমণ করত। জয়ী হলে তার রাজ্য আরো বড়ো হতো। কিন্তু ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ সাম্রাজ্য বাড়ানোর যুদ্ধ ছিল না। এই যুদ্ধ ছিল আমাদের মুক্তির লড়াই। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়। তখন বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের অংশ। কিন্তু একই দেশের মানুষ হয়েও বাংলাদেশের মানুষ নানাভাবে বঞ্চিত হচ্ছিল।

বেশির ভাগ যুদ্ধকে নির্দিষ্ট কাল দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯১৪ সালে আর শেষ হয়েছিল ১৯১৮ সালে। এভাবে যুদ্ধের সময়কাল নির্দিষ্ট করে বলা যায়। তবে এ দেশের মানুষের মুক্তির সংগ্রামকে নির্দিষ্ট সময় বা একটি যুদ্ধ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। কারণ, এ দেশের মানুষ যুদ্ধ করেছিল কোনো জাতিকে পরাজিত করতে নয়, কোনো দেশকে আক্রমণ করতেও নয়। মানুষ যুদ্ধ করেছিল নিজেদের মুক্তির আশায়। সেই মুক্তির সংগ্রাম অন্তত দু'হাজার বছর কিংবা তারও বেশি পুরানো। এই যুদ্ধ তাই গোলা-বারুদের কাহিনি নয়। ট্যাংক, কামান আর গানবোটের কাহিনি নয়। ইতিহাসের দিকে তাকালে তা-ই মনে হয়।

ইতিহাস বলে, সিন্ধু নদকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। প্রায় দু'হাজার বছর আগে বাংলাদেশ অঞ্চলে ছিল মৌর্য শাসন। এরপর মৌর্যদের পতন হয়েছে, শুরু হয় গুপ্ত শাসন। গুপ্ত শাসনের অবসানে কিছুকাল বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় দেশে। এরপর দীর্ঘ পাল সাম্রাজ্যের সূচনা।

পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। তারপর সেন রাজারা ক্ষমতায় আসে। তারা ছিলেন হিন্দু। তখন এ দেশে হিন্দু শাসনের বিস্তার ঘটে। এরপর ঘোড়া ছুটিয়ে নদীয়ায় এসে ক্ষমতা দখল করে নেন ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি। তখন থেকে প্রায় পাঁচ-ছয়শ বছরের মুসলিম শাসন। এই পর্বেই বাংলাদেশের মানুষ ব্যাপকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মুসলমান শাসনের অবসান হয় ব্রিটিশদের আগমনের পর। পলাশির প্রান্তরে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ উপনিবেশের কাল শুরু। তখন হাজী শরীয়তুল্লাহ্, দুদু মিয়া, তিতুমীর যুদ্ধ করেছেন। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মুক্তির পথ খুঁজেছেন। কিন্তু এ দেশের মানুষ তার অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয় পাকিস্তান পর্বে এসে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পাকিস্তান-পর্বে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ সংগ্রাম।

কিন্তু এভাবে শুধু শাসনক্ষমতা আর রাজনীতির বদল দিয়ে মুক্তির পথ-পরিক্রমা বোঝা যাবে না। কাল-পরিক্রমায় মানুষের মনোজগতেও চেতনাগত পরিবর্তন ঘটেছে। এ দেশের মানুষের এই চেতনাগত দিকটি বোঝা দরকার। যেমন, মনের দিক দিয়ে এ দেশের মানুষ খুবই সংবেদনশীল। মানে, খুব সহজেই তার হাসি পায়, কান্না পায়। অন্যের দুঃখে আর বিপদে সে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। আবার, এ দেশের মানুষ খুব অতিথিপরায়ণ। নিজে খেতে না পারলেও অতিথিকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে। আবার এ দেশের মানুষ উদারভাবে গ্রহণ করতে পারে। অন্যের ভাষা, অন্যের সংস্কৃতিকে আমরা তাই অচ্ছুত বা বাজে মনে করি না। সেখান থেকে প্রয়োজনমতো অংশগ্রহণ করি।

গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়েই মানুষের মধ্যে নতুন ধারণা তৈরি হয়। বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নেওয়ার মাধ্যমেই নিজের শক্তি বাড়ানো যায়। হাজার হাজার বছর ধরে এখানকার মানুষ এভাবে নিজেদের ধারণাকে পোক্ত করেছে, নিজেদের শক্তি বাড়িয়েছে। শাসনকে সে অমান্য করেনি। তবে শোষকের রক্তচক্ষুকে সে অগ্রাহ্য করেছে। তাই যখনই কেউ চোখ রাঙিয়েছে, এ দেশের মানুষ তার বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে। প্রতিবাদের মিছিল দিনে দিনে দীর্ঘ হয়েছে অযুত লোকের অংশগ্রহণে। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে এ দেশের মানুষ আসলে কাউকে আক্রমণ করতে চায়নি, বরং নিজেকে রক্ষা করতে চেয়েছে।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, জাতীয়তাবোধ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। অনেক জাতি মনে করে, তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্ববোধ যুদ্ধের দামামা বাজিয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো দু-দুটি যুদ্ধ ছিল শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই। সেই শ্রেষ্ঠত্ব আবার জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই। তার ফল ভালো হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ প্রবল জাতিবাদ দ্বারা আক্রান্ত নয়। জাতীয়তাবোধ এ দেশের মানুষের চিন্তাকে সংকীর্ণ করেনি। বরং তাকে মানবিক ও উদার করেছে। তাই সে অকাতরে অন্যকে দিতে পারে, নির্দ্বিধায় অন্যকে গ্রহণও করতে পারে। বাইরে থেকে আসা অন্য সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন আমাদের চিন্তাকে প্রসারিত করেছে।

মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ কেবল জাতিগত ব্যাপার নয়। আজ যে বিশ্বমানবতার কথা বলা হয়, তা এ দেশের মানুষের চিন্তার মৌল প্রবণতা। আমাদের জীবনযাপনে, আমাদের চেতনায় অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারটি জোরালোভাবে কাজ করে। আমরা উদারভাবে সবাইকে আর সবকিছুকে দেখতে শিখেছি। আমাদের মুক্তির সংগ্রাম তাই কেবল একটি যুদ্ধ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। ❑

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গল্প

অপারেশন বাগোয়ান

দীপু মাহমুদ

সকাল থেকে সূর্যের দেখা পাওয়া যায়নি। আজ হুট করে বেশি শীত পড়েছে। চুয়াডাঙ্গার শীত বেশ বিখ্যাত। মহিম দিনাজপুর থেকে চুয়াডাঙ্গায় ছোটোখালার বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। মহিম পড়ে ক্লাস এইটে। নভেম্বরে ইশকুলে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এখন ডিসেম্বর মাস।

মহিমের ছোটো খালুর নাম হাফিজ। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার। তিনি বাড়ির সবাইকে নিয়ে জগন্নাথপুর এসেছেন আটজন মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতি সমাধি দেখতে। ঢালের মতো

পাশাপাশি কবর। দু'ভাগে ভাগ করা চারটি-চারটি করে আটটা কবর। তার ওপর সবুজ ঘাস। শান্তিতে ঘুমাচ্ছেন সেখানে আটজন অসম সাহসী বীর বাঙালি সন্তান।

পাশেই নাটুদহ হাজার দুয়ারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সেখানে এসে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ইশকুল ভবনে এক হাজারটা দরজা আছে বলে ইশকুলের নাম হয়েছে হাজার দুয়ারী। প্রধান শিক্ষক ইশকুলের পাশে থাকেন। আজ ছুটির দিন। চুয়াডাঙ্গা থেকে বিদ্যুৎ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার এসেছেন শুনে তিনি চলে এসেছেন।

হাফিজ সকলের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, আমরা জগন্নাথপুরে গিয়েছিলাম আট মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিসমাধি দেখতে। শুনেছি মুক্তিযুদ্ধের সময় এই নাটুদহ ইশকুলে পাকিস্তানি বাহিনী ক্যাম্প বানিয়েছিল। যুদ্ধ হয়েছে এখানে। প্রধান শিক্ষক বললেন, আপনি সবই জানেন। সেই বীরদের কথা ভাবলে এখনো শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়। কী সাহস ছিল তাঁদের!

হাফিজ মোলায়েম গলায় বললেন, আপনি যদি ছেলে-মেয়েদের সেই ঘটনা বলতেন তাহলে ওরা আরও ভালোভাবে বুঝত।

প্রধান শিক্ষক যুদ্ধের সেই ভয়াবহ কাহিনি বলতে রাজি হলেন। তিনি আগেও কয়েকবার যুদ্ধের এই ঘটনা অন্যদের বলেছেন। প্রধান শিক্ষক বেশ গুছিয়ে গল্প বলার মতো করে বইয়ের ভাষায় কাহিনি বলে গেলেন।

সেদিন ৫ই আগস্ট, ১৯৭১ সাল। বৃহস্পতিবার। চুয়াডাঙ্গা জেলার সীমান্তঘেঁষা গ্রাম জয়পুর। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের শেল্টার। পাশেই এই নাটুদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটি। মুক্তিযোদ্ধারা সিদ্ধান্ত নিলেন পরদিন যখন পাকিস্তানি বাহিনী ঘাঁটি থেকে বের হয়ে গ্রামের দিকে যাবে তখন তারা পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাবে।

পরদিন সকালে রাজাকার কুবাতখাঁর লোকজন এসে মুক্তিযোদ্ধাদের খবর দিল রাজাকাররা বাগোয়ান গ্রামের মাঠ থেকে জোর করে গ্রামবাসীর ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে। এ খবর শুনে মুক্তিযোদ্ধারা ছুটলেন গ্রামবাসীর ধান ঠেকাতে। তাঁরা গিয়ে দেখেন তাদের মিথ্যা খবর দিয়ে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বাগোয়ান গ্রামের মাঠ পেরুলে নদী। ওপারে বটগাছ। মুক্তিযোদ্ধারা খেয়াল করলেন কেউ একজন বটগাছে আত্মগোপন করে আছে। প্রতিপক্ষের অবস্থান আর গতিবিধির ওপর নজর রাখা তার কাজ।

একজন মুক্তিযোদ্ধা তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন। অমনি নদীর ওপার থেকে ঝাঁকেঝাঁকে গুলি এসে পড়তে লাগল। বোঝা গেল নদীর ওপারে অসংখ্য পাকিস্তানি সৈন্য আছে। তারা নদীর ঢালে মাথা নিচু করে শুয়ে আছে।

মুক্তিযোদ্ধারা নদীরপাড় থেকে বাগোয়ান মাঠের দিকে চলে এলেন। খবর পাঠানো হলো জয়পুর শেলটারে। ২৪ জন মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ নিয়ে হাজির হলেন। তারা তখন ৩১ জন। সিদ্ধান্ত হলো পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে যাবেন। তারা দু'ভাগে ভাগ হয়ে সামনের দিকে এগুতে থাকলেন। ১৫ জন রওনা হলেন নদীর দিকে। ১৬ জনের দ্বিতীয় দল থাকল তাঁদের পেছনে।

মুক্তিযোদ্ধারা ভেবেছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নদীর ওপারেই আছে। পাকসেনারা নদীর ওপারে ছিল না। তারা নদী পার হয়ে এপারে চলে এসেছিল।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাগোয়ান মাঠের তিন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ফাঁদ তৈরি করে তারা এগিয়ে আসতে থাকল। ফাঁদ ধরতে পারেননি মুক্তিযোদ্ধারা।

আচমকা গুলির শব্দে তারা চমকে উঠলেন। তখন বুঝতে পারলেন ফেরার আর পথ নেই। তারা

আটকা পড়ে গেছেন।

পালটা গুলি ছুঁড়লেন মুক্তিযোদ্ধারা। শুরু হলো গোলাগুলি। পাকবাহিনী আছে সুবিধাজনক অবস্থানে। তাদের কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্র। মুক্তিযোদ্ধাদের মাথার ওপর দিয়ে বৃষ্টির মতো গুলি ছুটে যাচ্ছে সাঁইসাঁই করে। মাথা তুললেই মৃত্যু।

সাড়ে তিনঘণ্টা যুদ্ধ চলল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের জীবিত ধরার চেষ্টা করছিল। মুক্তিযোদ্ধারাও সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। ওরকম অবস্থায় পিছিয়ে যাওয়া সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। তিনদিক ঘিরে রেখেছে পাকবাহিনী। পেছন দিক দিয়ে সরে যাওয়া যায়। মুক্তিযোদ্ধারা পেছনে সরতে থাকলেন।

সবাইকে ঠিকঠাক মতো পেছনে সরে আসার জন্য দলের ভেতর থেকে একজনকে দায়িত্ব নিতে হয়। মেশিনগান দিয়ে অনবরত গুলি করে শত্রুপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত রাখা তার কাজ। যুদ্ধের ভাষায় তাকে বলে কাভারিং ফায়ার।

প্রধান শিক্ষক থামলেন। সবাই চুপ করে আছে। ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা। যেন খড় পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। ঘরের জানালা দিয়ে বাতাস আসছে। বাতাস আসার মিহি আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। আর কোনো শব্দ নেই।

প্রধান শিক্ষক গভীরভাবে শ্বাস টেনে নিলেন। এমন সময় হঠাৎ হাসানুজ্জামান নামে একজন মুক্তিযোদ্ধার ডান কাঁধে গুলি লাগল। তার কাঁধের হাড় গুঁড়ো হয়ে গেল। তিনি বেঁচে আছেন। তার কাঁধ থেকে রক্ত পড়ছে গলগল করে। হাসানুজ্জামান বুঝতে পারছেন তিনি বাঁচবেন না। বললেন, সবাই পিছিয়ে যাও। যতক্ষণ বেঁচে আছি আমি কাভারিং ফায়ার দিয়ে যাব।

আরেকজন মুক্তিযোদ্ধা জোয়ার্দার পিন্টু এগিয়ে এলেন হাসানুজ্জামানের কাছে। বললেন, কাভারিং ফায়ার আমি দিচ্ছি। আমরা একসঙ্গে পিছিয়ে যাব। হাসানুজ্জামান বললেন, দুজনের মরে যাওয়ার থেকে একজন বেঁচে যাওয়া ভালো।

প্রধান শিক্ষক ঘোর লাগা গলায় বললেন, হাসানুজ্জামান অনর্গল গুলি ছুঁড়ে চলেছেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর। মুক্তিযোদ্ধার দল পিছিয়ে আসছে। তখন একটা গুলি এসে লাগল আরেকজন মুক্তিযোদ্ধা কিয়ামুদ্দিনের মাথায়। তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়ে গেলেন।

সেখানে ছিলেন আটজন মুক্তিযোদ্ধা। হাসানুজ্জামান, কিয়ামুদ্দিন, আফাজউদ্দিন, আলাউল ইসলাম খোকন, আবুল কাশেম, রওশন আলম, রবিউল ইসলাম রবি আর খালেদ সাইফুদ্দিন আহমেদ তারিক। পাকিস্তানি বাহিনী তাদের ঘিরে ফেলল। পাকিস্তানি সেনারা খুব কাছ থেকে আটজন মুক্তিযোদ্ধাকে গুলি করল। শুধু গুলি করে থামেনি, পাকিস্তানি সৈন্যরা অসম সাহসী আটজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেছে।

জানালা দিয়ে বাইরে ইশকুল মাঠের দিকে তাকিয়ে আছেন প্রধান শিক্ষক। উদাস দৃষ্টি। তিনি চুপ করে আছেন। কেউ কোনো কথা বলছে না। খোলা জানালা দিয়ে ঘরে রোদ আসছে। বাতাস হচ্ছে। বাতাসে গাছের পাতা নড়ছে। গাছের পাতা নড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। গাছ থেকে শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে মাটিতে।

প্রধান শিক্ষক নীচু গলায় বললেন, পরদিন শুক্রবার। পাকিস্তানি সেনারা আটজন বীর শহিদ মুক্তিযোদ্ধার লাশ তুলল লাল চাঁদের গরুর গাড়িতে। সেই লাশ তারা আশপাশের গ্রামে ঘুরিয়ে দেখাতে থাকল। তারা মানুষজনকে হুঁশিয়ার করে দিতে লাগল, যেন কেউ তাদের ছেলে-মেয়েকে যুদ্ধে না পাঠায়। যুদ্ধে গেলে তাদের অবস্থা হবে এই আটজনের মতো।

পরের দিন শনিবার। জগন্নাথপুর মসজিদের ইমাম সাহেব এগিয়ে এলেন। তিনি পাকিস্তানি সৈন্যদের লাশ দাফনের কথা বললেন। জগন্নাথপুর গ্রামের মাঠে একজন কৃষকের জমিতে লাশ নামানো হলো। ধর্মমতে তাদের দাফন করার কথা বলল গ্রামবাসীরা। গ্রামের মানুষজন বলেছিল লাশের জানাজা না হোক অন্তত কবর খুঁড়ে, লাশ কবরে রেখে ওপরে বাঁশ দিয়ে মাটি দেওয়া হোক।

বর্বরতার চরম সীমা পেরিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানি সৈন্যরা। তারা গ্রামবাসীর অনুরোধ শোনেনি, অগ্রাহ্য করেছে। পাকিস্তানি সৈন্যরা দুটো গর্ত করে তাতে চারজন করে আটজনকে মাটি চাপা দিয়ে দেয়।

আটজন বীর মুক্তিযোদ্ধা পাশাপাশি দুটো জায়গায় ঘুমিয়ে আছেন। কে কোথায় তা বোঝার কোনো উপায় নেই। বুকের ভেতর থেকে বাতাস বের করে প্রধান শিক্ষক বললেন, বাংলাদেশ হঠাৎ স্বাধীন হয়ে যায়নি। কেউ এসে আমাদের স্বাধীন করে দিয়ে যায়নি। এদেশের সাহসী মানুষ যুদ্ধ করেছেন। নিজ জীবন উৎসর্গ করে যারা দেশ স্বাধীন করেছেন তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা।

প্রধান শিক্ষক কাহিনি শেষ করেছেন। কোনো কথা না বলে সকলে চুপচাপ প্রধান শিক্ষকের ঘর থেকে বের হয়ে এসেছে। তারা এসে দাঁড়িয়েছেন ইশকুল মাঠে। বিশাল মাঠ। কুয়াশা কেটে গিয়ে সূর্য দেখা গেছে। সোনামাখা রোদ্দুরে ভরে আছে চারপাশ। আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ। ❑

শিশুসাহিত্যিক

মুক্তিযুদ্ধ ও আমার আলাপন

আবু জাফর আবদুল্লাহ্

তৎকালীন বৃটিশ সরকার ভারতকে দুই ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করেন– মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে একটা, আরেকটা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে। প্রথমটা পাকিস্তান, দ্বিতীয়টা হিন্দুস্তান। ভারতের বেলুচিস্তান, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে হয় পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান থাকায় আমরা পাকিস্তান রাষ্ট্রে পড়ি। ত্রিপুরা ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামসহ পূর্ব বাংলার নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। সেই পূর্ব বাংলা পাকিস্তানে না পড়লে আজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হতো না। পেছনে একটু চোখ ফেরালেই দেখা যাবে, পূর্ব বাংলাকে আলাদা করার জন্যে 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন' -এর বিশাল ভূমিকা রয়েছে।

এখানেই শেষ নয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, ব্যর্থ হবার পর স্যার নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় চাওয়া হয় ব্রিটিশ সরকারের কাছে। ব্রিটিশ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে, যার কার্যক্রম শুরু হয় ১৯২১ সালের ৪ঠা জানুয়ারি। বলতে দ্বিধা নেই সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হলে আজ বাংলাদেশ হতো না। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্বাধিকার তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন। স্যার নবাব সলিমুল্লাহ অক্লান্ত পরিশ্রম করে ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল (এসএম) প্রতিষ্ঠা করেন। শোনা যায়, সামাজিক বিভিন্ন কল্যাণকর কাজ করতে গিয়ে তিনি তার সহধর্মিনীর ৪৯ ভরি স্বর্ণালংকার বন্দক রেখেছিলেন।

যাহোক, আমার দেশীয় এক বড়ো ভাইয়ের সহযোগিতায় আমি এসএম হলে সিট পেয়ে যাই। আমি ওই হলের আবাসিক ছাত্র ছিলাম। আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের একটি সুবিধা হলো প্রয়োজনে যখন-তখন হলের বাইরে যাওয়া যায়। এজন্যই সব ক'টি আন্দোলনে আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের সাথে আমিও অংশ নিতে পেরেছিলাম। সেই সময়ের বিখ্যাত এবং দীর্ঘতম মিছিলে অংশ নেবার সৌভাগ্যও হয়েছিল আমার। নীলক্ষেত কলাভবন থেকে ঢাকার বিভিন্ন

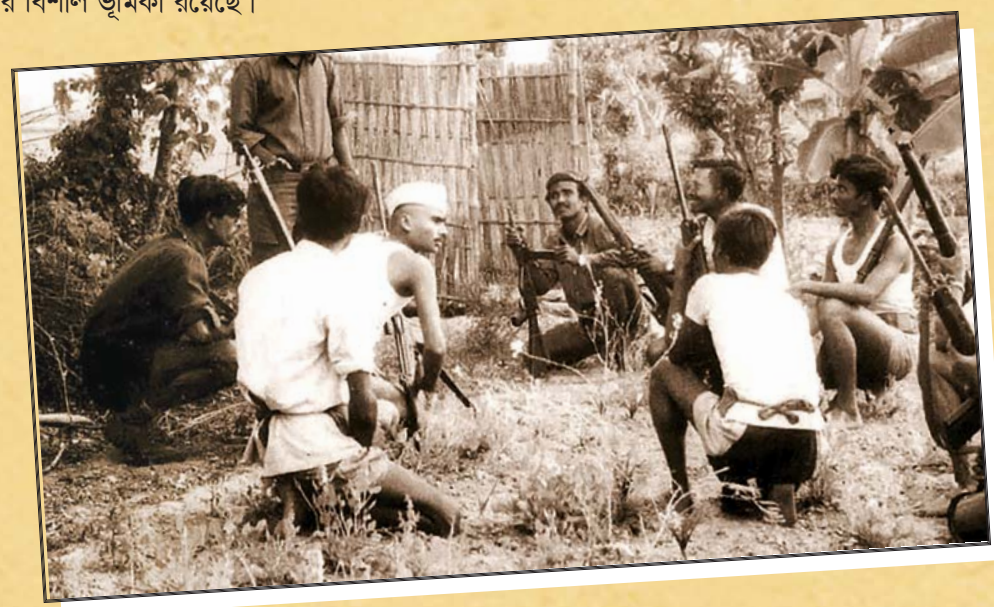

পথ ঘুরে গুলিস্তান থেকে সদরঘাট যাবার রাস্তা হয়ে 'বাহাদুর শাহ পার্ক' (আগের ভিক্টোরিয়া পার্ক) এর সামনে দিয়ে ইসলামপুর, চকবাজার হয়ে ইডেন কলেজের সামনে দিয়ে ফের কলা ভবনে ফিরে আসি মিছিল নিয়ে আমরা সেদিন।

৬ দফা আন্দোলন, গণআন্দোলন এবং গণঅভ্যুত্থান প্রভৃতি সব আন্দোলনের মিছিল এবং সভায় অংশ নিতে নিতে ১৯৬৯ সালে আমার এমএ পরীক্ষা হয়ে যায়। '৬৯ সালের জুনে আমি হল ত্যাগ করার পর চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানায় একটি প্রাইভেট কলেজে লেকচারার হিসেবে মাত্র দুই মাস চাকুরি করি। '৬৮ সালে অনার্স পরীক্ষা শেষে রেডিও পাকিস্তানের অনুষ্ঠান প্রযোজক ও অধিবেশন তত্ত্বাবধায়ক পদে লোক নেবার বিজ্ঞপ্তি দেখে অনুষ্ঠান প্রযোজক পদে আমি দরখাস্ত করি। এমএ পরীক্ষার রেজাল্ট হবার কদিন পরই ঢাকায় নেওয়া হয় ভাইভা। তখন শিল্প-সাহিত্যে অবদানকারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হতো। আমি কবিতা, ছোটোগল্প, ফিচার লিখতাম বলে আমার কাঙ্ক্ষিত পদে আমাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। তৎকালীন রেডিও পাকিস্তান রংপুর কেন্দ্রে যোগদানের জন্য আমাকে বলা হয়। আমি আমার পূর্বের কর্মস্থল ত্যাগ করে ১৯৭০ সালের ২৬শে অক্টোবর অনুষ্ঠান প্রযোজক পদে যোগদান করি। রংপুর থেকে কলেজের লেকচারার পদের ইস্তফা দেওয়ার দরখাস্ত পাঠাই এবং এক মাসের বেতন আর শোবার বিছানাপত্র ছেড়ে আসি।

রংপুর রেডিওতে কাজকর্ম সুপারভাইজ করার জন্যে একজন পুরুষ ও একজন নারী উর্দু ভাষী এবং একজন উর্দু-বাংলা জানা পুরুষ ও একজন উর্দু-বাংলা জানা নারী মোট চারজন কেন্দ্রে রাখা হয়। অতি সাবধানে কাজ করতে করতে '৭১ সাল এসে গেল। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনও তীব্রতর হতে থাকে তখন।

'৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত ১২টা ১ মিনিটে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সব জায়গায় একযোগে গণহত্যা চালায় পাকিস্তান হানাদার বাহিনী। থানা ও পুলিশ ব্যারাকে হামলা চালায় এবং গ্রামগঞ্জে আগুন ধরিয়ে নারী-পুরুষ-শিশু-কিশোর নির্বিশেষে গণহত্যা চালায়। ২৫শে মার্চের সেই রাতকে তাই 'কালরাত' বলা হয়। পরদিন ২৬শে মার্চ যুদ্ধ ঘোষণা করে হানাদার বাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য শক্তভাবে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়।

সেই থেকে '৭১ সালের ২৬শে মার্চ 'স্বাধীনতা দিবস' এবং বিজয় ছিনিয়ে এনে সে বছরের ১৬ই ডিসেম্বর 'বিজয় দিবস' হিসেবে আমরা পালন করে আসছি।

আমি রেডিও পাকিস্তান রংপুর কেন্দ্রে চাকুরি করার সময় ছুটিতে ঢাকায় যেতাম। তখন যেতে হতো আরিচা-নগরবাড়ি ফেরির মাধ্যমে। দোতলা স্টিমার তখন যমুনা নদীর ঢেউয়ে কাঁপতো। বিশাল নদী ছিল যমুনা। ফারাক্কা চালুর ফলে সেই যমুনা আর নেই। চর পড়ে তাতে কাশফুল দোলে এখন বাতাসে– এ দৃশ্য দেখে খুব কষ্ট হয়। এখনকার যমুনায় ডিঙি নৌকাও আর কাঁপে না। ❑

কবি ও প্রাবন্ধিক

সত্য ঘটনা অবলম্বনে গল্প

মুক্তিযোদ্ধা হাড়গিলা

আশিক মুস্তাফা

তোমরা তো মুক্তিযুদ্ধের অনেক গল্প শুনেছ। সিনেমায় দেখেছ মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসীকতা। চলো, আজ এক সাহসী হাড়গিলা মুক্তিযোদ্ধা পাখির গল্প শুনি। হাড়গিলা পাখিকে তো অনেকেই চেনো। এই পাখিটির ওজন প্রায় আট-দশ কেজির কাছাকাছি। হাতের মতো লম্বা ঠোঁট দেখতে যেন ৩০৩ রাইফেলের বেয়োনেট। শক্ত, চোখা আর ধারালো ঠোঁট দিয়ে ওরা যেমন জোরে জোরে 'ঠোঁটতালি' বাজাতে পারে, তেমনি ঠোকর দিয়ে ছোটো আকারের কচ্ছপের পিঠ ফুটোও করে দিতে পারে! যখন হাঁটে তখন মনে হয় পেশাদার সৈন্যরা মার্চ করছে। আর শত্রু দেখলেই হলো; বিপদ বুঝতে পারলে রাজ্যের সাহস বুকে নিয়ে আক্রমণ করে, বিশাল পাখা দুটি মেলে থাপ্পড় মারে তিরাশি মন ওজনের! আর ঠোঁট দিয়ে যে কী করতে পারে তা তো বললামই।

সে যাক, একদিন এই বিশাল সাইজের একটি হাড়গিলা পাখি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনিস্টিটিউটে নিয়ে এলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। দেশে তখনো যুদ্ধ লাগেনি। আর চারুকলা ইনস্টিটিউটও চারুকলা হয়নি; তখন এটি ছিল বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় নামে। শিক্ষার্থীরা পাখিটির ছবি আঁকত। বিশেষ করে ড্রইং নকশা করায় পাখিটি ছিল খুব কাজের। পোষা হাড়গিলা পাখিকে মডেল বানিয়ে কত কত ছবি আঁকা হয়েছে তখন। বর্তমান চারুকলার বকুলতলার মাঠেই হাড়গিলাটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকত। কখনো হাঁটতো ধীরে, পা ফেলে। একটু এদিক-সেদিক হাঁটাহাঁটি করে আবার দাঁড়িয়ে থাকত। উড়াউড়িতে তার তেমন আগ্রহ ছিল না। হয়ত ইচ্ছে করেই এমন করত। যেন শিক্ষার্থীদের ছবি আকায় কোনো সমস্যা না হয়!

এভাবেই বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে প্রায় নয় বছর কেটে যায় হাড়গিলা পাখিটির। এই নয় বছরে সে যেমন সবার আপন হয়ে ওঠে, তেমনি বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ও তার প্রিয় বাসস্থান হয়ে যায়। এর বাইরে সে কোথাও যায় না। দিনরাত সবই কাটে তার এখানে। এরমধ্যেই দেশে যুদ্ধ লাগে! পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ২৫শে মার্চ রাতে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ইপিআর কেন্দ্র, রাজারবাগ পুলিশ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক হলসহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও লোকালয়ে হামলা চালায়। এই তালিকা থেকে বাদ যায় না বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ও। রাতে তারা যখন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চারুকলার দিকে এগিয়ে আসে তখন হাড়গিলা পাখিটি বুঝতে পারে। ধীর পায়ে হাঁটা, প্রায় নিশ্চুপ হাড়গিলা পাখিটি গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে। রাজ্যের সাহস যেন ভর করে তার মধ্যে। চারুকলায় তখন তেমন কেউ না থাকলেও হানাদার বাহিনী হামলা চালায় সেখানে। তাদের হামলায় মালি নোনা মিয়ার তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়। এই দেখে যেন আরো খেপে যায় দুঃসাহসী হাড়গিলা। নিজেকে শান্ত রাখতে পারে না আর। প্রচণ্ড গোলাগুলি উপেক্ষা করে দু'পাখায় ঝড়ের আওয়াজ তুলে উড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে হানাদার বাহিনীর উপর। আচমকা ধাক্কা খেয়ে দুজন পাক-হানাদার মাটিতে পড়ে যায়। পাখিটা এই সুযোগে বিশাল দু'পাখা মেলে তাদের থাপ্পড় মারতে

থাকে দোর্দণ্ড প্রতাপে। আর লম্বা ঠোঁট দিয়ে সৈন্যদের ঠোকরাতে থাকে। তার ঠোঁকরের তীব্রতা যেন আরও বেড়ে যায়! ঠোকরাতে ঠোকরাতে দুই সৈন্যের অবস্থা খারাপ করে দেয়। তাদের কাতরানোর শব্দ শুনে অন্য সৈন্যরা তাকাতেই চোখে তালা লেগে যায় যেন! তারা বিশ্বাসই করতে পারে না যে একটা পাখি তাদের উপর হামলা চালিয়েছে। তড়িঘড়ি সৈন্যরা ঠ্যা-র‍্যা-র‍্যা গুলি ছুড়তে থাকে।

গুলির ধকল সামলাতে না পেরে হাড়গিলা পাখিটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এরপর আস্তে আস্তে তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। ঝাপসা চোখে সে যেন দেখতে পায়, চারুকলার শিক্ষার্থীরা তাকে ঘিরে বসে আছে। আর তাকে নিয়ে গর্ব করে বলছে, যেই দেশের চারুকলা তাকে এত ভালোবাসা দিয়েছে, সেই দেশের চারুকলার জন্য সে তার জীবন বিলিয়ে দিয়েছে, এই হচ্ছে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা হাড়গিলা পাখি।

সেই কালরাতে হাড়গিলা পাখির গলথলিটা যেন হ্যান্ডগ্রেনেডের মতো ঝুলেছিল তার বুকে! সেই হ্যান্ডগ্রেনেড বুকে ধারণ করা বীর হাড়গিলা পাখির দৃষ্টি আস্তে আস্তে ঝাপসা হতে হতে যেন মিলিয়ে যায়। নিস্তেজ হয়ে যায় দেহ। হানাদার বাহিনী পাখিটির মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে চারুকলা ছাড়ে। আড়াল থেকে তখন বেরিয়ে আসে চারুকলার আরেক মালি ও ঝাড়ুদার সাধু। সে পাখিটির দিকে তাকিয়ে থাকে অবাক চোখে। তারপর তাকে বুকে চেপে অঝোরে কাঁদতে থাকে। তার কান্নায় ২৫শে মার্চের রাত যেন আরও কালো হয়ে আসে! ❑

সাংবাদিক ও শিশুসাহিত্যিক

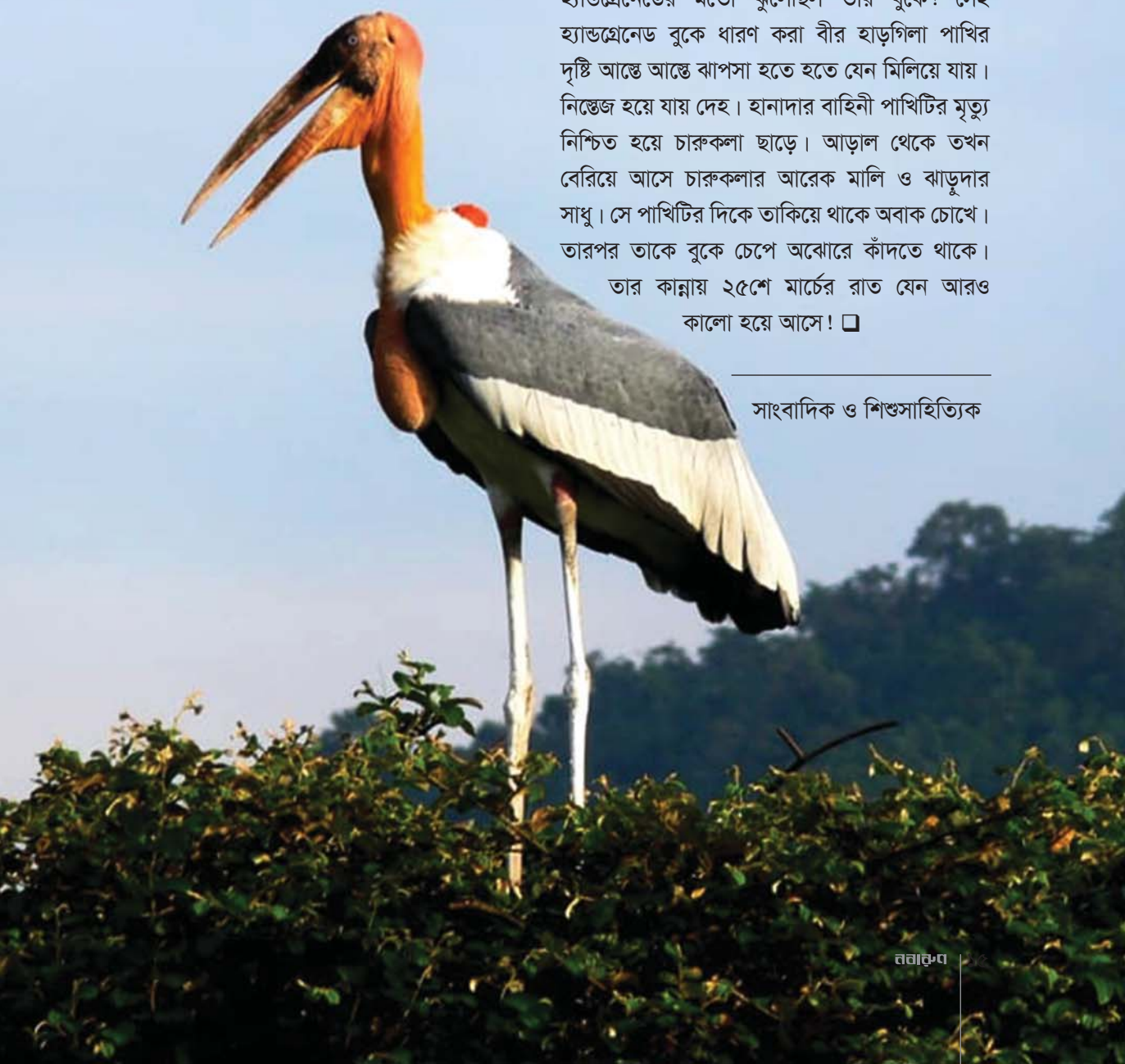

গল্প

দাদুর মুক্তিযুদ্ধ

এম. আতিকুল ইসলাম

বারান্দার ইজি চেয়ারটায় বসে আছেন রহমান সাহেব, হাতে ধোঁয়া ওঠা এক কাপ গরম চা। দক্ষিণের এই বারান্দাটা উনার বড্ডপ্রিয়। বারান্দা থেকেই বধ্যভূমিটা চোখে পড়ে কিনা। কীভাবে যে চোখে পানি এসে যায় বুঝতে পারেন না। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরেই সোজা দাদুর রুমে পাঁচ বছরের নাতি নিহান।

'দাদু, আগামীকাল বিজয় দিবসকে ঘিরে আমার স্কুলে গল্প বলা প্রতিযোগিতা হবে। তুমি তো কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। আমি তোমার যুদ্ধ দিনের কাহিনিই সবাইকে শোনাবো।'

সেই দিনগুলোর কথা মনে হতেই রহমান সাহেবের চোখে পানি আসে। ডাক্তার দেখাতে হবে মনে হচ্ছে। নিহান চুপচাপ মোড়ায় বসে দাদুর দিকে তাকিয়ে থাকে। রহমান সাহেব শুরু করলেন, 'বুঝলে দাদু

ভাই, তখন আমি পনেরো বছরের কিশোর। দেশের অবস্থা খুব খারাপ। স্কুল-কলেজ সব বন্ধ হয়ে গেল। আমার বন্ধুরা সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। কেউ গেল নানু বাড়ি, কেউবা সীমান্তপাড়ি দিয়ে ভারত। আমি খুব একা হয়ে গেলাম। সারাদিন টো টো করে বাড়ির আশপাশেই ঘুরতে থাকি।

এ করেই দিন কাটতে লাগল। মার্চ মাসের শেষের দিকে পরিস্থিতি আরো খারাপ হলো। প্রতিদিন সন্ধ্যা রাতেই দেখতাম বাবা, ছোটো চাচা আর স্কুলের পলাশ স্যার বাড়ির কাছারি ঘরটায় কী যেন ফিসফাস করতেন। মা উনাদের জন্য চা বানিয়ে আমাকে দিয়ে পাঠাতেন। চা নিয়ে গেলেই উনারা চুপ হয়ে যেতেন। আমার সেই কিশোর মনে চাপা আগ্রহ। যদিও জানতাম, ঠিক হচ্ছে না, তারপরও কতবার যে আড়ি পাতার চেষ্টা করেছি, উনাদের কথা শুনতে পারিনি। বাবা আর ছোটো চাচ্চুকে কিছু জিজ্ঞেস করলেই দিতেন ধমক ।

শেষে একদিন থাকতে না পেরে পলাশ স্যারকেই ধরলাম, যিনি আমার খুব প্রিয় স্যার ছিলেন। স্যার আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন। উনার কথা শুনে আমি খুব অবাক হলাম। কি সাংঘাতিক কথা! সবাই তলে তলে তৈরি হচ্ছেন যুদ্ধে যাবার ! এসব নিয়েই চলছে নানা রকমের পরিকল্পনা ।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। স্যারকে বললাম, 'স্যার আমিও দেশের জন্য কিছু করতে চাই।' স্যার বললেন, 'তুই তো অনেক ছোটোরে।'

উত্তরে বললাম, 'স্যার, দেশের জন্য কিছু করার কি অধিকার আমার নেই?' স্যারের চোখে পানি, কিছু বললেন না। শুধু বলে গেলেন, আজ মাগরিবের পর বাড়িতে আয়।

অবশেষে সন্ধ্যায় স্যারের বাড়িতে। স্যার শুধু বললেন, মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয়েছে তোকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। বুঝলাম বড়োদের মিটিং-এ আমার প্রবেশাধিকার নেই। তবে আমি খুশি, দায়িত্ব একটা কিছু তো পেয়েছি! তা যতই ছোটো ভূমিকার হোক না কেন ।

গ্রামের শেষে একটা ফল-ফলাদির বাগিচা আছে। এমনিতে আমার খুব প্রিয় জায়গা ওটা। গ্রীষ্মকালে আম- কাঁঠাল আর শীতকালে পাকা কুল; আহা কোন ফলটা ছিল না ওই বাগিচায়। মাঝের ফাঁকা অংশে মাটিতে লাটিম ঘোরাতাম। যাই হোক আমার কাজ ছিল বাগিচার উত্তর দিকে ঠাঁয় দাঁড়ানো বটগাছটার কোঠরে খাবার রেখে আসা। কিছু মুক্তিসেনার জন্য এ আয়োজন; যাতে তারা গ্রামে না ঢুকেও খাবার পেতে পারে।

এভাবেই আমি সকলের চোখ এড়িয়ে কাজ করে যাচ্ছিলাম। ছোটো বলে কেউ সন্দেহ করত না। তবে একদিন সত্যি সত্যি বিপদে পড়ে গেলাম। তিনজন ইয়া লম্বা পাঠান পাক সেনার হাতে ধরা পড়লাম। 'খাবার কোথায় নেওয়া হচ্ছে? কার জন্য নেওয়া হচ্ছে?' সে এক চরম জেরা।

প্রথমে কিছুটা ঘাবড়ে গেলেও পরক্ষণেই সামলে নিলাম। এ ঘোর বিপদে মাথা ঠান্ডা রাখা চাই। ইশারা- ইঙ্গিতে বললাম এ খাবার পাশের মসজিদের ইমাম সাহেবের জন্য। এরপর কী বলল তেমন কিছুই বুঝিনি। তবে এতটুকু বুঝলাম ওদের জন্যও খাবার আনতে হবে। মনে মনে যত দোয়া পারি, সব পড়া শুরু করলাম। এরপরে কোনোরকমে মসজিদে গিয়ে ইমাম সাহেবকে সব খুলে বললাম। ইমাম সাহেব ছিলেন মাটির মানুষ; বললেন 'ব্যাটা ভয় পাস না। তুই স্যারের কাছে যা, আর সব খুলে বলিস।' আমি অবাক হলাম! ইমাম সাহেবও তাহলে সব জানেন!

এরপর স্যারের কাছে এসে সব বললাম। স্যার শুনে আমাকে বাহবা দিলেন। বললেন, 'খবর পেয়েছি ওই তিনজন এ এলাকার নজরদারির দায়িত্বে আছে। কাল একটা ছোটো অপারেশন হবে, আর সেই অপারেশন তোকেই করতে হবে।'

স্যার এরপর বুঝিয়ে দিলেন কী করতে হবে। পরদিন আবার ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় পাকসেনাদের অপেক্ষা করতে লাগলাম, যেন ওই তিনজনই আসে। ভাগ্য সহায় হলো। অবশেষে আসলো। আমি কোনোরকম আকারে ইঙ্গিতে বুঝাতে পারলাম, তোমাদের জন্য

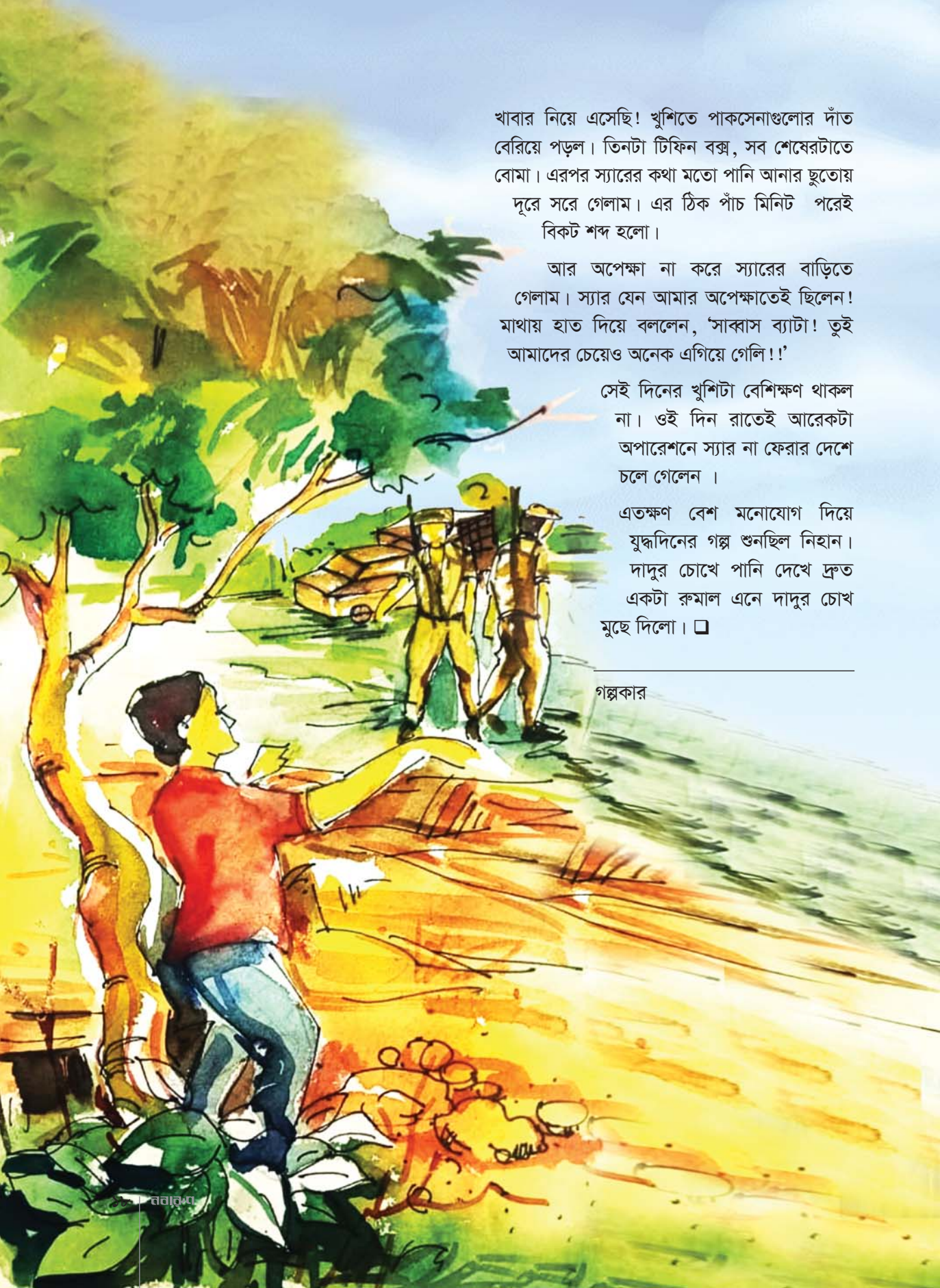

খাবার নিয়ে এসেছি! খুশিতে পাকসেনাগুলোর দাঁত বেরিয়ে পড়ল। তিনটা টিফিন বক্স, সব শেষেরটাতে বোমা। এরপর স্যারের কথা মতো পানি আনার ছুতোয় দূরে সরে গেলাম। এর ঠিক পাঁচ মিনিট পরেই বিকট শব্দ হলো।

আর অপেক্ষা না করে স্যারের বাড়িতে গেলাম। স্যার যেন আমার অপেক্ষাতেই ছিলেন! মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'সাব্বাস ব্যাটা! তুই আমাদের চেয়েও অনেক এগিয়ে গেলি!!'

সেই দিনের খুশিটা বেশিক্ষণ থাকল না। ওই দিন রাতেই আরেকটা অপারেশনে স্যার না ফেরার দেশে চলে গেলেন ।

এতক্ষণ বেশ মনোযোগ দিয়ে যুদ্ধদিনের গল্প শুনছিল নিহান। দাদুর চোখে পানি দেখে দ্রুত একটা রুমাল এনে দাদুর চোখ মুছে দিলো। ❑

গল্পকার

মাতৃভূমি

মুসতাফা আনসারী

আকাশ-মাটি-পাহাড়, নদী
হাওর-বাওড়, বিল
গাছে পাখি, দূর আকাশে
শক্ত ডানার চিল।

সোনাফলা সবুজ মাঠে
ধান সাগরের ঢেউ
মনোলোভা এমন শোভা
ভুলবে না তো কেউ।

মন উদাসী রাখাল বাজায় বাঁশি
পাখির গানে গানে
শেষ বিকেলে সাঁঝের মেয়ে
রাত্রি ডেকে আনে।

রূপের রানি রূপকুমারী
কাজল কালো কেশ
সেই তো আমার মাতৃভূমি
সোনার বাংলাদেশ।

রক্তের বিনিময়ে

নকুল শর্ম্মা

গল্প নয়রে সত্যি খোকা
এটাই ইতিহাস,
অনেক রক্তের বিনিময়ে
বাংলায় করি বাস।

জন্ম সেদিন হয়নিরে তোর
ছিলি মায়ের জঠর,
তাই তো খোকার হয়নি দেখা
পাকবাহিনী বর্বর।

গায়ে যে তোর পিতার রক্ত
বইছে অবিরাম,
তুই যে খোকা সেই সে জাতি
বাঙালি তোর নাম।

শোনরে খোকা বলছি তোকে
রাখিস দেশের মান,
বাবার আদর মায়ের স্নেহে
থাকতে দেহে প্রাণ।

আমাদের দেশ

আজহার মাহমুদ

অপরূপ সুন্দরে ভরা
আমাদের এই দেশ,
এই দেশেতে জন্ম নিয়ে
গর্ব আমার বেশ।

নানান ঋতুর এদেশ নিয়ে
অবাক পুরো বিশ্ব,
সুজলা, সুফলা, প্রকৃতি আর
আছে মনোরম দৃশ্য।

এদেশের সৌন্দর্যেও গল্প
শোনা যায় পৃথিবীর সবখানে
আমাদের এই দেশকে সবাই
বাংলাদেশ নামে জানে।

বিজয় বাংলাদেশ

বিজন বেপারী

রবির গালে পাচ্ছে শোভা
জাতির অহংকার
সে যে প্রিয় লাল-সবুজের
সেরা অলংকার।

মুক্ত স্বাধীন পায়রাগুলো
আজকে খুশি বেশ
ন'মাস পরে এবার এল
স্বাধীন বাংলাদেশ।

হাসিমুখে মাঠ ছেড়েছে
দামাল ছেলেরা
সেই বিজয়ে স্বাক্ষী ছিল
কৃষক-জেলেরা।

ডিসেম্বরে রক্তের খেলা
হয়েছিল শেষ
অবশেষে মুক্ত স্বাধীন
বিজয় বাংলাদেশ।

বিজয়ের সকাল

সাফায়েত উল্লাহ

বাংলার আকাশ রাঙা হলো
উঠল রাঙা সূর্য,
লাল-সবুজের পতাকা আজ
করছে বিজয় সৌর্য।

মা হারিয়েছে আপন সন্তান
ভাই দিয়েছে প্রাণ,
তাদের রক্তে গড়া দেশ
গর্বে ভরে প্রাণ।

শিশুরা শিখুক যেন
দেশের প্রতি টান,
এই পতাকা আমাদের
এইটা গর্বের গান।

আমার এদেশ

সজীব মালাকার

এই দেশেতে মায়া আছে
আছে মায়ের কোল,
কান্না-হাসি সবই আছে
আছে কোলাহল।

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি
আছে ঘরে ঘরে,
তাদের কাছে শিশু-কিশোর
বড়ো হয় আদরে।

মায়ের কাছেই হয় যে শিশুর
প্রথম খেলা-পড়া,
রঙিন ছবির দিকে চেয়ে
শিশু শিখে ছড়া।

প্রতি শিশু হাসিখুশির
মাঝেই বড়ো হয়,
এদেশ ছাড়া এমন মায়া
কোথাও যে আর নয়।

স্বাধীনতার পঙক্তি

আহসানুল হক

স্বাধীনতা !
যুদ্ধ করে ছিনিয়ে আনা
একটি সবুজ খাম

স্বাধীনতা !
রক্তে লেখা নিজ ঠিকানা
বাংলা যে তার নাম !

স্বদেশ আমার মায়ের আদল
কী মমতায় আঁকা
বীর শহিদের রক্তরেখায়
একাত্তরে আঁকা !

বিজয়ের গান

মো. আব্দুস সালাম

বিজয় মানে স্বাধীনতা
বিজয় মানে প্রাণ,
বিজয় মানেই ভালোবাসা
দেশের প্রতি টান।

যুদ্ধে যায় বীর বাঙালি
সাহস নিয়ে মন,
তাদের জন্য আজ দেখি
স্বাধীনতার ধন।

আমরা সবাই গাইছি
মহান বিজয়ের গান,
এই দেশটি প্রিয় আমার
এটাই আমার প্রাণ।

গল্প

কিশোর কিরণ

মুহসীন মোসাদ্দেক

কিরণ, বারো বছরের কিশোর ছেলে। দাঁড়িয়ে আছে ব্রিজের কিনারে, ভাঙা রেলিংয়ের মাঝে। মুখ ফিরে আছে ব্রিজের দিকে, পেছনের পা একটু বেকায়দা হলেই সে টুপ করে পড়ে যাবে নদীতে! গ্রামের পাশ দিয়ে ছোটো ছোটো ঢেউ তুলে বয়ে গেছে ছোটো এক নদী। এ গ্রাম থেকে শহরে যাবার এই একটিই পথ, পথের মাঝ দিয়ে নদী বয়ে যাওয়ায় দুই পাশের পথের সংযোগ হয়েছে এ ব্রিজ দিয়ে। ব্রিজটা অনেক পুরনো। কয়েক জায়গায় রেলিং ভেঙে গেছে, আরও কয়েক জায়গায় রেলিং কাত হয়ে আছে, যে-কোনো সময় তা ভেঙে পড়ে যেতে পারে নদীতে! ব্রিজের উপর দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তার পিচ উঠে গিয়ে বেশ কয়েক জায়গায় গর্ত হয়ে গেছে। এমন ভাঙাচুরা ব্রিজের উপর দিয়ে যেখানে স্বাভাবিক চলাচলই বিপজ্জনক, সেখানে কিরণ দাঁড়িয়ে আছে ভাঙা রেলিংয়ের মাঝে ব্রিজের কিনারে!

পেছন-মোড়া করে হাত বাঁধা কিরণের। গামছা দিয়ে শক্ত করে বাঁধা তার চোখ। ব্রিজের অন্য পাশের রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে জমির উদ্দিন ব্যাপারী। চালের ব্যাপারী জমির উদ্দিন এলাকায় ব্যাপক প্রভাবশালী। বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে তার। চালের সওদাপাতির বাইরেও তার গোপন কিছু বাণিজ্য আছে বলে লোকে বলাবলি করে। 'যা কিছু রটে, তার কিছু তো বটে' এ সূত্রে জমির উদ্দিন লোকটা ভালো না তা বলে দেওয়া যায়। জমির উদ্দিনের পাশে তার দুই খাস লোক, মকবুল আর হাকিম। মকবুল হালকা-পাতলা গড়নের, গায়ের রং কালো। হাকিম মোটাসোটা নাদুসনুদুস ফর্সা মানুষ। জমির উদ্দিনের সাথে তাদের চলাফেরা। পান চিবাতে চিবাতে জমির উদ্দিন মুচকি হাসিমুখে তাকিয়ে আছে কিরণের দিকে। মকবুল তীক্ষ্ণ, আর হাকিম কৌতুকময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে কিরণকে।

জমির উদ্দিন পানের পিক কিরণের পায়ের গোড়ায় ফেলে মুচকি হেসে কৌতুক করে বলে, 'বাজান, ভয় পাও? ভয় পাও নাকি বাজান?'

মকবুল আর হাকিম দুলে দুলে মৃদু হাসে। কিরণ কোনো জবাব দেয় না। তার মুখের ভঙ্গিও পরিবর্তন হয় না। মুখে অবিচল এক দৃঢ় ভঙ্গি ফুটে আছে তার তখন থেকেই, তাকে যখন থেকে ধরে এনে এখানে দাঁড় করানো হয়েছে।

জমির উদ্দিনের ভালো লাগে না তা, অসম্মান বোধ করে। একটু এগিয়ে যায় কিরণের দিকে, কিছুটা দৃঢ় করে মুখভঙ্গি, 'তুমি ছোটো মানুষ, সঙ্গ দোষে ভুলভাল করে ফেলেছ। এখন ক্ষমা চেয়ে আমাদের কথামতো কাজ করলেই বাঁইচা যাইবা কিন্তু!'

কিরণ তবু মুখ খোলে না। মুখভঙ্গির দৃঢ়তার কোনো পরিবর্তন হয় না এবারও।

খ্যাপে যায় জমির উদ্দিন, 'জবানে আওয়াজ নাই ক্যান, হ্যাঁ? কথা কানে ঢোকে না?' দাঁত কিড়মিড় করতে থাকে জমির উদ্দিন।

হাকিম পাশ থেকে শান্ত করতে চায় জমির উদ্দিনকে, 'বাচ্চা পোলা, ধমকানোর দরকার নাই, ওস্তাদ। বেশি ডরায় গেলে ভ্যাঁ ভ্যাঁ কইরা কানতে থাকব। কিছুই তখন বলতে পারব না। একটু বুঝায়া নেন।'

'এহ, বাচ্চা পোলা!' মকবুল বিরক্তি নিয়ে বলে, 'যে আকাম করছে এই পোলায় তাতে বাচ্চা পোলা মনে কইরা হালকাভাবে দেখার সুযোগ নাই। কড়া কইরা টাইট দ্যান, ওস্তাদ।'

দুই সঙ্গীর বিপরীত মন্তব্যে জমির উদ্দিন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে।

তারপর শান্তস্বরে বলে, 'মুক্তিরা কই থাকে, এইটুকু শুধু কইয়া দে, তোরে ছাইড়া দিমু।' শুরুতে তুমি করে বলে কাজ না হওয়ায় তুই করে সম্বোধন শুরু করে জমির উদ্দিন।

কিরণ কিছু বলে না।

'তুই পোলাপান মানুষ, তোর লগে লাইগা আমাগো কাম নাই। ছাইড়া দিমু, মুক্তিরা কই থাকে কইয়া দে, বিনা শর্তে ছাইড়া দিমু।'

কিরণ তবু মুখ খোলে না।

'এই পোলায় কথা কয় না ক্যান?' রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে জমির উদ্দিন। হুমকি দেয়, 'তোর জানের মায়া নাই?'

বলাবাহুল্য, কিরণ কোনো আওয়াজ করে না। সে ঠিক করেছে, কোনোভাবেই কোনো কথা বলবে না। সে যে কিছু বলবে না, এ কথাটাও সে মুখ খুলে বলবে না। মুখ থেকে কোনো কথাই সে বের করবে না, জীবন গেলেও না!

জমির উদ্দিন প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করে, 'দেখ, তুই হয়ত ভাবতাছোস বা ভয় পাইতাছোস যে, মুক্তির খবর কইয়া দিলেই তোরে আমরা মাইরা ফেলব। সত্যি কইতাছি, খালি মুক্তির খবর কইয়া দে, ওদের ধরায় দে আমাগো হাতে, তোর গায়ে কেউ একটা টোকাও দিবো না।'

কিরণ প্রলুব্ধ হয় না। অবিচল থাকে।

স্বাধীনতার জন্য দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে কিরণ জড়িয়ে পড়ে মুক্তিবাহিনীর সাথে। গ্রামের শফিক ভাই ট্রেনিং নিয়ে এসে এ গ্রামকে হানাদারমুক্ত করার জন্য পরিকল্পনা করতে থাকে। সে পরিকল্পনার সূত্রেই কিরণ যুক্ত হয় মুক্তিবাহিনীতে। গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে খুব কাছেই বর্ডার। সেখান থেকে গোলা-বারুদ-অস্ত্র আনা-নেওয়া, মিলিটারিদের অবস্থান, তাদের হালচাল, এসব খবর শফিক ভাইয়ের মুক্তিবাহিনীকে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নীরবে পালন করেছে সে। সরাসরি মিলিটারি ক্যাম্পে হামলা না করলেও বেশ কয়েকবার তাদের বিপাকে ফেলেছে শফিক ভাইয়ের মুক্তিবাহিনী। রাস্তায় এক জিপ মিলিটারিকে উড়িয়ে দিয়েছে একবার। খাবারে বিষ মিশিয়ে কয়েকজন মিলিটারিকে মারা হয়েছে নিজেদের ক্যাম্পেই। আর গ্রামে টহল দেওয়া কয়েকজন মিলিটারিকে গুম করে দেওয়া হয়েছে। এর সবগুলোতে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছে কিরণ। ছোটো মানুষ হওয়ায় কারো

সন্দেহ হয়নি কিরণকে। মিলিটারিরা বেশ দিশেহারাও হয়ে পড়ছিল, কীভাবে কারা তাদের ওপর এভাবে নিভৃতে আঘাত করে চলেছে। তারা তা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না। এভাবে মিলিটারিদের সংখ্যা কমে আসায় এবং তাদের এই দিশেহারা অবস্থার সুযোগে দু-একদিনের ভেতরেই সরাসরি মিলিটারি ক্যাম্পে হামলা করে তাদের দখল থেকে গ্রামকে মুক্ত করার পরিকল্পনা ছিল শফিক ভাইয়ের মুক্তিবাহিনীর। কিন্তু কিরণের বর্ডারের দিকে যাওয়া-আসার ব্যাপারটা জমির উদ্দিন ব্যাপারীর খাস লোকগুলোর নজরে পড়ে যায়। আর তাই তাকে তুলে এনে পেছন-মোড়া করে হাত বেঁধে, চোখ বেঁধে ব্রিজের ভাঙা রেলিংয়ের মাঝে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে জমির উদ্দিন ব্যাপারী। যেন কিরণ ভয়ে-আতঙ্কে সব বলে দেয়। কিন্তু কিরণকে তারা টলাতে পারে না।

জমির উদ্দিনের কাছে অবশ্য নিশ্চিত প্রমাণ নেই। কেবল ধারণা ও সন্দেহের বশেই তাকে তুলে এনেছে। কিন্তু কিরণ একবারও মুখ খোলেনি। বলেনি, 'সে কিছু জানে না', কারণ তা মিথ্যা। সে কোনো মিথ্যা কথা

বলবে না। সে এ-ও বলেনি যে, 'সে জানে, কিন্তু কিছু বলবে না'। সে যে কিছু জানে তা সে স্বীকার করেনি, করবেও না। এ কারণে যা কিছুই ঘটে যাক, মুখ সে খুলবে না।

জমির উদ্দিন আরেকবার চেষ্টা করে, দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'কিছু কইবি না তাইলে?' শেষে হুংকার দেয়, 'মারা পড়বি কিন্তু!'

কিরণকে তবু বিচলিত দেখায় না। মুখভঙ্গিতে ফুটে থাকা দৃঢ়তা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

জমির উদ্দিন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। ওদের থেকে একটু দূরেই দুজন মিলিটারি কিরণের বুক বরাবর বন্দুক তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। জমির উদ্দিন ইশারা দিয়ে তাদের বুঝিয়ে দেয়, সে এই বাচ্চা ছেলের মুখ খোলাতে পারছে না।

কিরণ টের পায় জমির উদ্দিনের ইশারা। সে আগের মতোই অবিচল-নির্বিকার। শফিক ভাইয়েরা কি জানতে পেরেছে যে, কিরণ ধরা পড়ে বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে? শফিক ভাইয়েরা কী আসবে তাকে উদ্ধার করতে? কিরণ নিশ্চিত নয়। শফিক ভাইদের ঘাঁটিতে আর কে খবর নিয়ে যাবে গ্রাম থেকে!

কিরণ ভাবে, সে নদীতে ঝাঁপ দিবে কিনা। চোখ আর হাত বাঁধা থাকলেও পা দুটো খোলা। শুধু পা নাড়িয়েও নিজেকে হয়ত বেশ কিছুক্ষণ ভাসিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু, নদীটা খুব বড়ো নয়, গভীরতাও তেমন বেশি না, ঝাঁপ দিয়ে পালিয়েও কি সে বন্দুকের গুলি থেকে বাঁচতে পারবে? পানিতে যত সময় সে ভাসতে পারবে এবং মিলিটারির বন্দুকের গুলি যতক্ষণ তার নাগাল পাবে না, ততক্ষণে কি শফিক ভাইয়েরা এসে পৌঁছাতে পারবে? কিরণ নিশ্চিত হতে পারে না।

কিরণ ঠিক করে সে পালাবে না। বুক চিতিয়ে অবিচল দাঁড়িয়ে থাকবে। যা কিছুই ঘটে যাক, ভড়কাবে না, মাথা নোয়াবে না, কোনো আকুতি প্রকাশ করবে না। বুকভরা তার লাল-সবুজের সাহস। ❑

গল্পকার

বিজয় দিবস

এনামুল কবীর

অস্ত্র হাতে কৃষক শ্রমিক,
জয়ের জন্য পেতে বুক
তাদের হাত ধরে পেয়েছি
এই বিজয়ের সুখ।

একটি ভোর এসেছিল
রাঙা রোদ লেগে,
লাল-সবুজ পতাকা পেয়ে
মনে আনন্দ বাজে।

আজো আমরা গাই
বিজয়ের গান,
শহিদরাই আমাদের
ভালোবাসা ও প্রাণ।

আমার বাংলাদেশ

তানভির আহমেদ

লাল-সবুজের দেশটা আমার
করছে আলো ঝলমলে,
শস্যে ভরা মাঠখানি
গানে গানে চলে।

এক সময় ছিল দুঃখ ভারী
শাসন চাপা কাঁধে,
বাঙালি তখন জেগে উঠল
বুকে সাহসেরই সাধে।

মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে
রাখলো বীরের তাজ,
স্বাধীনতা এনে দিয়ে
স্মরণীয়-বরণীয় আজ।

গল্প

মুক্তির সুখ

নাসরীন খান

মায়ের সাথে বেড়াতে যাব অনেক দিন পর। মা ভীষণ ব্যস্ত থাকেন। চাকরির সুবাদে বিভিন্ন জায়গায় যান কিন্তু আমার যাওয়া হয় না খুব একটা। আমার স্কুল ছুটি থাকলে মায়ের সময় হয় না আবার মায়ের ছুটি থাকলে আমার হোম টিচার, পড়া সব নিয়ে সুযোগ থাকে না।

মা এবার পাঁচ দিন ছুটি নিয়েছেন। দাদার বাড়ি যাওয়া হবে। কখনো অনলাইনে, কখনো অফলাইনে ক্লাস এসব করতে করতে আমিও ভীষণ ক্লান্ত, একঘেয়ে লাগছে। মূলত আমাকে সময় দেবার জন্যই মা এবার ছুটি নিয়েছেন।

ভেবেছিলাম এবার ট্রেনে করে যাব। কিন্তু ট্রেনে গেলে আঠারোবাড়ি স্টেশনে নেমে আবার অটোতে করে অনেকখানি যেতে হয় বলে মা এবারের মতন মানা করলেন। বাসেই যাব সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা।

রাতে সমস্ত কিছু গুছিয়ে নিলাম। আমাকে এ ব্যাপারে মায়ের সাহায্য করতে হয় না। যে সব মায়েরা চাকরি করেন তাদের সন্তানরা স্বাবলম্বী হয়। নিজের কাজ নিজে করে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

যথাসময়ে রওয়ানা হলাম, গাজীপুর চৌরাস্তায় যাওয়ার পর বিপত্তি সৃষ্টি হলো। একঘণ্টা ধরে বাস এগুচ্ছে মন্থর গতিতে। প্রচণ্ড জ্যাম, প্রায় এক কিলোমিটার লম্বা লাইন। মা ফ্লাক্সে করে চা নিয়ে এসেছিল বলে রক্ষা। আমি ওয়েফার ভিজিয়ে চা খেলাম। খারাপ লেগে আমার বমি বমি লাগছিল। আশপাশে চোখ রাখলাম, ভালো কিছু দেখা যায় কিনা? মনের পরিবর্তন জরুরি এই মুহূর্তে। কুয়াশার চাদর মাড়িয়ে একটু সূর্যের আলোর আভা দেখা যাচ্ছে। দূরের গাছগুলো যেন হাসছে।

বিকেলের দিকে গ্রামের প্রবেশপথে পৌঁছালাম। আমাদের গ্রামটা ছবির মতো সুন্দর। সামনে বিশাল ফসলের মাঠ। মাঝখানে গ্রাম তার পিছনে সবার

ফলের বাগান আর বাঁশঝাড়। তারপর আবারো মাঠ পেরিয়ে আর একটি গ্রাম। গ্রামগুলো গুছানো ঠিক যেন শিল্পীর তুলির আঁচড়ে আঁকা কোনো চিত্র। একসারিতে দাঁড়িয়ে পুরোটা গ্রাম। আমি অনেক গ্রামে গিয়েছি কিন্তু এটি সেরা আমার কাছে। বিকেলের রোদ কিছুটা আছে এখনো। পাখির কিচিরমিচির শব্দ শোনা যাচ্ছে। প্রত্যেকের হাঁস, মুরগি ঘরে ফিরছে। ছোটো ফুপু ওদের খাবার দিচ্ছে আর ডাকছে,

- আয়, তই তই। আয় তই তই।

সামনের পুকুর থেকে ছোটো চাচা মাছ ধরে আনল আমাদের জন্য।

দিদা আমাকে সবগুলো ডালায় ঢেলে দেখাচ্ছে। সবগুলো মাছ নড়ছে। সেকি সুন্দর লাগছে!!

দিদা চা আর গরম গরম ভাঁপ-ওঠা পিঠা দিল খেতে। দূর থেকে শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে। গা ছমছম করছে ভয়ে। বারান্দায় বসে আছি, পাশে মা। মাটির চাড়ির ভিতরে আগুন জ্বলছে। সবাই সেটাকে ঘিরে গোল করে বসে আড্ডা চলছে। কত কথা সবার!

দিদার সাহায্যকারী মেয়েটা ঢেঁকিতে পিঠার চাল গুঁড়ি করছে আর গীত করছে। আঞ্চলিক ভাষায় গাইছে, আমি সব বুঝতে পারছি না। কিন্তু ভালো লাগছে। একটা উৎসব উৎসব আমেজ বাড়িময়।

সকালে গরম গরম পিঠা আবারও। গাছ থেকে কলা পারা হলো। বিকেলে কলার পিঠা বানানো হবে। এই আনন্দগুলো নিজের ভেতর যে তোলপাড় তোলে তা লিখে বা বলে বুঝানো যায় না।

দিদার কাছে রাতে শুলাম। সে গল্প বলছে। ভূতের গল্প কিন্তু বেশির ভাগ কথাই আমি বুঝতে পারছি না। তবুও শুনতে ভীষণ ভালো লাগছে। আমরা পরদিন মায়ের মামা বাড়ি যাব। দিদা আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করছে। আরো থাকলাম না কেন? এই কষ্ট তাকে পীড়ন দিচ্ছে। আমার চোখেও পানি চলে আসছে। আগে দিদা ঢাকায় গিয়ে অনেক দিন থাকত কিন্তু এখন বয়স হয়েছে তো তাই যেতে পারে না।

আমার ভীষণ ইচ্ছে ছিল কোনো এক মুক্তিযোদ্ধার সাথে পরিচিত হয়ে কথা বলব। তাঁকে ছুঁয়ে দেখব। মা আমার এই শখ পূরণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো তার মামার বাড়ি কিশোরগঞ্জে। নানা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন তিনি যখন ক্লাস নাইনে পড়েন সে সময়।

বজলু নানা মায়ের আপন মামা।

কেন্দুয়া থেকে অটোতে করে কিশোরগঞ্জে পৌঁছাতে সময় লাগল দু'ঘণ্টা।

নানা আমাকে আর মাকে দেখে ভীষণ খুশি।

- শেষ পর্যন্ত আইবি আইবি কইরা আইলি তাইলে। আমি জোয়ান থাকতে তোর পোলারে লইয়া আইলি না। কান্দে লইয়া ঘুরতাম পারতাম।

- মামা, আমার পোলা হাঁটতে পারে। তোমার কান্দে লওয়ন লাগত না।

- নাতিরারে কান্দে কইরা ঘুরাইনের মজা আছে বেডি, এইডা তুই বুঝতি না।

- আমার নাতি আমারে দেখত চাইছে! এইডাই আমার কাছে মেলা খুশির। আমার খুব আনন্দ লাগতাছেরে বেডি। অহন তো কেউ আর আমরার খোঁজ নেয় না।

- মামা, আমার ছেলেকে তোমার অনেক গল্প বলেছি। এখনও তোমার মুখ থেকে শুনবে বলেই এসেছে।

- আমি অনেক খুশি অইছি ভাই।

নানা চোখ মুছছে হাতের তালুতে। সে খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নানা আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, মায়ের মুখে শুনেছি।

সারারাত ধরে তার মুখে অনেক কথা শুনলাম। কথাগুলো বলার মুহূর্তে তার যে অনুভব অনুভূতি হয় তা স্বচক্ষে দেখলাম।

কি উচ্ছ্বাস আর উদ্যমতায় তারা নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে দেশটার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল! ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি ঝরে। বন্ধুদের কথা, অপারেশনের কথা, খেয়ে না খেয়ে লড়েছে দেশের জন্য সেসব কিছু তাকে এখনো উদ্বেলিত করে।

বাঁচাইবাম। কত রাইত যে ঘুমাই নাই কইতাম পারতাম না।

আমার উদ্দেশে বললেন, তোমরারে দেহি টেলিভিশনে। তোমরারেও ভালা লাগে। আমার ছোটোবেলার স্মৃতি মনে অয়। খুব ভালা। তোমারাও অনেক সাহসী ভাই। তোমরা দেশের ভবিষ্যৎ। আমরা তো অহন বুড়া অইয়া পড়ছি।

নানা। আমিও গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের মতোন হতে পারব না। তোমাদের অবদান সীমাহীন। অনেক বড়ো তোমরা।

ঠিকই কইছ। আমি যখন যুদ্ধে গেছিলাম তহন আমার মা-বাবা আমারে কুরবানি দিছিল দেশের জন্য। তাঁরাও অনেক কষ্ট সহ্য করছিল ভাই। সবার ত্যাগেই এই দেশ।

আমার কাছে তহন রাইত আর দিনের কোনো পার্থক্য আছিল না। খালি চিন্তা করতাম কেমনে দেশটারে

নানার কথা শুনে আমারও চোখ দিয়ে গড়গড় করে পানি বের হচ্ছে। দেশের জন্য এখনো তার সেই একই টান। দেশ কী? তা যেন আমি হাতেকলমে শিখতে এসেছি নতুন করে। তাঁর কাছে দেশ মানে নিশ্চিত শান্তি আর সুখের আশ্রয়।

আমি আগে কখনো এটা অনুভব করিনি। দায়িত্ববোধের সাথে ভালোবাসা থাকলে সেই দায়িত্ব যথাযথ পালিত হয়। নইলে দায়সারা হয় সবকিছু। সুন্দর একটা দেশ আমরাও চাই, সবাই চায়। কিন্তু ত্যাগ কজন করতে পারে? আমরাও অন্যায়ে, দুর্যোগে এক হই কিন্তু ভালোবাসার কমতি থাকে। আজ সেই ভালোবাসাটাও যোগ করতে জানলাম যেন। ❑

কবি ও প্রাবন্ধিক

আমাদের গাঁ

মো. জাহিদুর রহমান

এসো সোনামণি সব
এসো ফুল-কলি
আমাদের গাঁয়ে এসো
তোমাদের বলি।

আমাদের গাঁয়ে আছে
শ্যামল মা মাটি
ফুল আর ফসলেতে
বেশ পরিপাটি।

সবুজের সমারোহ
ছায়া-সুনিবিড়
পটে আঁকা ছবি যেন
কোনো শিল্পীর।

জন্মেছি এই দেশে

এম. আলমগীর হোসেন

কুমির হরিণ বাঘের মাঝে
জন্মেছি এই দেশে,
তাই তো স্বাধীন ভয়ভীতিহীন
বাঁচি সৎ সাহসে।

ঘূর্ণিঝড় আর বন্যা-খরায়
নদী-সাগর চষে,
লড়াই করে বাঁচতে শিখি
বিরূপ পরিবেশে।

কারো ঝাড়ি খবরদারি
রুখি বীরের বেশে,
বীর বাঙালির উন্নত শির
মুক্ত অবশেষে।

জন্মভূমি বাংলা তুমি
আছো প্রাণে মিশে,
মরতে পারি যেন মাগো
তোমায় ভালোবেসে।

g|w ³ ‡hv×v `v `|

আলমগীর কবির

আমাদের একটা গোয়েন্দা দল আছে। দলের সদস্য আমরা তিনজন। আমি কবির, আবির আর রূপম। আমরা নবম শ্রেণিতে পড়ি, রাজাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। ছোটোরা গোয়েন্দা হলে দারুণ বিড়ম্বনায় পড়তে হয় অনেক সময় । তেমনি একটি বিড়ম্বনা থেকে বেঁচে ফিরেছি আমরা। ভুল তথ্য পেয়ে একবার গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে ফেঁসে গিয়েছিলাম আমরা। একে তো ডিসেম্বর মাস। স্কুলে ছুটি হয়ে গিয়েছে। ভেবেছিলাম গোয়েন্দাগিরি করে কাটিয়ে দেবো বাকি দিনগুলো। তা আর হলো না। সব রাগ গিয়ে পড়ল রূপমের ওপর। ওর বোকামির জন্যই হয়েছে যত গণ্ডগোল।

তারপর একদিন রূপম বলে, তোদের একটা সুখবর দিই। আমি গাজীপুর মামার বাড়িতে যাচ্ছি। তোরা চাইলে যেতে পারিস। সপ্তাহ খানিক থেকে আসি চল। যাবি নাকি?

রূপম চলে গেলে আমাদের দল দূর্বল হয়ে যাবে। গোয়েন্দাগিরি আর জমবে না!

আমি আর আবির ভাবতে থাকি। কী করা যায়? আবির বলে, যাওয়া যায়। কী বলিস? আমিও ভেবেচিন্তে বলি ঠিক আছে যাবো, তবে এইবার কিন্তু আর কোনো বোকামির কাজ করবি না!

তিন বন্ধুই হেসে ফেলি একসাথে।

গতকাল আমরা নাটোর থেকে ট্রেনে গাজীপুর এসেছি। গাজীপুরে বেড়ানোর মতো অনেক জায়গা আছে। প্রথমদিন গিয়েছিলাম সাফারি পার্কে। আজকে কোথায় যাবো জানি না। রূপম বলল, আজকে আমরা একটি বৃদ্ধাশ্রমে যাব। এখানে কাছেই একটি বৃদ্ধাশ্রম আছে।

ঘণ্টা দুয়েক পরে আমরা বৃদ্ধাশ্রমে পৌঁছে যাই। আমাদের সাথে আছেন রূপমের মামা। তিনি প্রথমেই বৃদ্ধাশ্রমের ভেতরে যাবার অনুমতি নিয়েছেন। তাঁর এক বন্ধু এখানে কর্মরত আছেন। তিনি বলছিলেন, তোমাদেরকে জীবন সমন্ধে অনেক কিছু জানতে হবে। দেশকে জানতে হবে। ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে দেশের কোথায় কী আছে।

আমরা তিনজন ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম চারপাশে। রূপমের মামা তার বন্ধুর সাথে গল্প করছিলেন। বৃদ্ধাশ্রমের পরিবেশটা অনেক সুন্দর। অনেক জায়গাজুড়ে গাছপালা, ফুলবাগান। একপাশে পুকুর। অন্য পাশে সারি সারি ঘর। সবকিছু দেখেশুনে তবুও আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়। এখানকার মানুষগুলোর ব্যবহার এত ভালো অথচ পরিবারের কাছে তারা কেন বোঝা হয়ে গিয়েছিলেন! মানুষগুলোর জন্য মনের মাঝে অনেক মায়া হয়। এ এক অন্যরকম অনুভূতি। এই জন্যই হয়ত মামা আমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন। আমরা ঘুরতে ঘুরতে ফুল বাগানের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। পাশে একটি বেঞ্চে একজন বয়স্ক লোক বসেছিলেন। আমাদের দেখে তিনি মৃদু হাসলেন। বসো তোমরা। কোথা থেকে এসেছ তোমরা?

আমি বলি, নাটোর থেকে।

তিনি বললেন, আমাদের বাড়ি পাবনা ছিল। নাটোরের পাশেই।

আবির বলে, ছিল কেন বলছেন?

তিনি বললেন, এখন নেই তাই। আমরা তাকে আর এ ব্যাপারে কিছু বলি না। হয়ত কোনো কষ্টের গল্প আছে। রূপম বলে, দাদু যদি কিছু না মনে করেন একটা কথা বলব?

বলো বাবারা বলো, তোমাদের সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগছে।

আচ্ছা আপনার হাতে কী হয়েছে?

দাদু মৃদু হেসে বললেন, গুলি লেগেছিল। সেই একাত্তরে!

আমরা তিনজন একসাথে বলে উঠি, আপনি মুক্তিযোদ্ধা!

হ্যাঁ মুক্তিযোদ্ধা। আমরা দারুণ অবাক হয়ে যাই।

তারপর...

তিনি একে একে তাঁর জীবনের গল্প বলেন। মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলেন। বৃদ্ধাশ্রমে আসার গল্প বলেন। সব শুনে আমাদের চোখ জলে ভিজে যায়।

আবির বলে, দাদু, আপনাকে যদি এখান থেকে নিয়ে যাই আমরা? তাহলে যাবেন আমাদের সাথে? মুক্তিযোদ্ধা দাদু বলেন, না দাদু ভাই। আমি তো জীবনের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আমার দিন এভাবেই কেটে যাবে। তোমরা শুধু আমার জন্য দোয়া করো। তাহলেই হবে। আর একটি চাওয়া, দেশকে তোমরা ভালোবেসো মায়ের মতো। সুখে-দুঃখে দেশের পাশে থেকো।

একদিন তোমাদের হাত ধরে আলোর সকাল হাসবে। দেশ এগিয়ে যাবে।

দাদুকে আমাদের স্যালুট জানাতে ইচ্ছে করে। একসময় আমাদের বিদায় নেবার সময় হয়ে আসে।

আচ্ছা দাদু আমরা আবার আসব আপনাকে দেখতে। আপনি ভালো থাকবেন।

চোখ ভরা জল নিয়ে আমরা বাড়ির পথে হাঁটতে থাকি। একজন মুক্তিযোদ্ধাকে কী আমরা তাঁর যোগ্য সম্মান দিতে পারলাম? ❑

শিশুসাহিত্যিক

মহান বিজয়

সাবরীনা ইসলাম

যুদ্ধ করে বিজয় আনবে
গিয়েছে করে পণ,
স্বাধীন দেশে কাটাবে
সকল আনন্দ ক্ষণ।

সবটা ফেলে গেল তারা
অস্ত্র তুলে হাতে
বাড়ির কাউকে না জানিয়ে
গেল আঁধার রাতে।

নয় মাস যুদ্ধ শেষে
উড়িয়ে সকল ভয়,
সবাই এল বীরের বেশে
নিয়ে মহান বিজয়।

সপ্তম শ্রেণি, সিদ্ধেশ্বরী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

বিজয়

মিহির হোসেন

যুদ্ধ শেষে বিজয় এল
হারিয়ে গেল কত প্রাণ
তাদের বিনিময়ে মোরা
গাই বিজয়ের গান।

বুকের তাজা রক্ত দিয়ে
মুক্ত করে দেশ
নীল আকাশে সবুজ পতাকা
উড়ছে দেখো বেশ।

অষ্টম শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

গল্প

weRtqi GB w`tb

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

দশ বছর পর দেশে ফিরেছে ইমন। ফিরে দেখে এ দেশের সবকিছু কেমন যেন বদলে গেছে! বিশেষ করে সাংস্কৃতিক দিকটা। তরুণরা সব ব্যান্ড সংগীত নিয়ে ব্যস্ত। দেশীয় গান কাউকে গাইতে দেখা যায় না। পড়াশোনায় সবাই কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত। দেশীয় খাবারের চেয়ে বিদেশি খাবারের প্রতি ছেলে-মেয়েরা বেশি আগ্রহী। প্রত্যেকের হাতে হাতে মোবাইল ফোন।

দেশে ফিরে ইমন প্রথম বোনের বাসায় উঠল। ইমন যখন বিদেশে যায়, তখন তার বোনের বিয়ে হয়। বিদেশ থেকে ফিরে দেখে তার বোনের যমজ এক ছেলে ও এক মেয়ে হয়েছে। ওদেরকে ইমন এই প্রথম দেখল। তাই আনন্দে ওদেরকে আদর করল, কোলে উঠিয়ে নিল। ইমনের মা বোনের বাসাতেই ছিল। মা তখন বলল, মায়ের আগে ভাগনের আদর বেশি!

ইমন হেসে বলল, ওদের আর কখনো আমি দেখিনি; শুধু নাম শুনেছি। তাই এই প্রথম দেখাতে ওদের আদর তো একটু বেশি হবেই!

মাও তখন ইমনের কথা শুনে হেসে উঠল!

পরদিন ইমন মাকে নিয়ে বাড়ি যেতে চাইলে দুলাভাই বলল, দুই দিন পর শোয়েব আর সানির জন্মদিন। ওদের জন্মদিনটা খেয়েই যাও।

ইমনও ভাবল, এতদিন পর দেশে ফিরেছি। ওদের এই প্রথম দেখলাম। ওদের জন্মদিনটা খেয়েই বাড়িতে যাব।

ইমন তার বোনকে বলল, আপা শোয়েব আর সানির জন্মদিনটা আমি নিজে করতে চাই। ওদের কোনো জন্মদিনে আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি। তাই এবার ওদের জন্মদিনটা আমি নিজে টাকা খরচ করে করব।

আপা বলল, বিদেশ থেকে ফিরেছিস। তোর ইচ্ছে কি না করা যায়? আচ্ছা ঠিক আছে, ওদের জন্মদিন এবার তুই টাকা খরচ করে করিস।

আপা কথা রাখাতে ইমন খুশি হলো।

পরদিন শোয়েব আর সানিকে নিয়ে ইমন মার্কেটে গেল। ওদের নতুন জামাকাপড় কিনে দিল। তারপর ফুলের দোকানে গেল ফুল কেনার জন্য। ফুল দিয়ে জন্মদিনে ঘর সাজানো হবে।

ইমন যখন ফুলের দোকানে ঢুকছে তখন থেকেই দেখল, একজন বৃদ্ধলোক ছেঁড়া পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি পরা, তার পিছু নিয়েছে। মনে হচ্ছে লোকটি কিছু বলতে চাইছে। ইমন লোকটির দিকে না তাকিয়ে সরাসরি ফুলের দোকানে ঢুকল। দোকানের মালিকের সাথে কথা বলে কিছু ফুল কিনল। দোকান থেকে বের হওয়ার সময় আবার লোকটাকে দেখল, তার পিছনে পিছনে আসছে। ইমন তখন রাগ হয়ে বলল, আপনি কী চান? ভিক্ষুক মনে করে বলল যে, আমার কাছে এখন কোনো ভাংতি টাকাপয়সা নেই।

লোকটি তখন বলল, বাবা আমি আপনার কাছে টাকাপয়সা চাই না।

তাহলে কী চান?

আমারে দুইডা ফুল কিননা দিবেন?

লোকটির কথা শুনে ইমনের বেশ কৌতূহল হলো তার প্রতি! ভাবল, একজন গরিব বৃদ্ধ লোক, সে ফুল দিয়ে কী করবে? ফুল কিনতে চায় কেন?

ইমন লোকটিকে আবার জিজ্ঞেস করল, ফুল দিয়ে কী করবেন?

কালকা শহিদ স্মৃতিস্তম্ভে দিমু।

কালকে শহিদ স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিবেন কেন?

বাবা কালকা তো বিজয় দিবস, আপনে জানেন না? এই দিনে দেশ জয়ী হইছিল।

ইমনের হঠাৎ মনে হলো, 'একজন ভিক্ষুক তার বিজয় দিবসের কথা মনে আছে! অথচ আমার মনে নেই! আগামীকাল যে বিজয় দিবস। বিদেশে গিয়ে টাকার পিছনে ছুটতে ছুটতে নিজ দেশের বিজয় দিবসের দিনটির কথা ভুলে গেছি'! এ ভেবে ইমনের বেশ লজ্জা হলো। আর লোকটির প্রতি কৌতূহলের মাত্রা আরও বেড়ে গেল।

ইমন লোকটিকে বলল, আপনাকে শহিদ স্মৃতিস্তম্ভে কে ফুল দিতে বলেছে?

কে আবার কইব! এই দিনে দেশ জয়লাভ করেছে। নয় মাস যুদ্ধ কইরা আমগো দেশের অনেক মানুষ পাকিস্তানিরা মারছে; অনেক ক্ষতি করছে। হেরপর এই দিনে অগো হারাইয়া আমগো দেশ জিতছে। এইডা একটা আনন্দের কথা না! আমি তো এই যুদ্ধ নিজ চক্ষে দেখছি।

লোকটি যেভাবে যুদ্ধের কথা বলল- বর্ণনা দিল, তাতে লোকটিকে দুটো ফুল কিনে না দিতে ইমনের

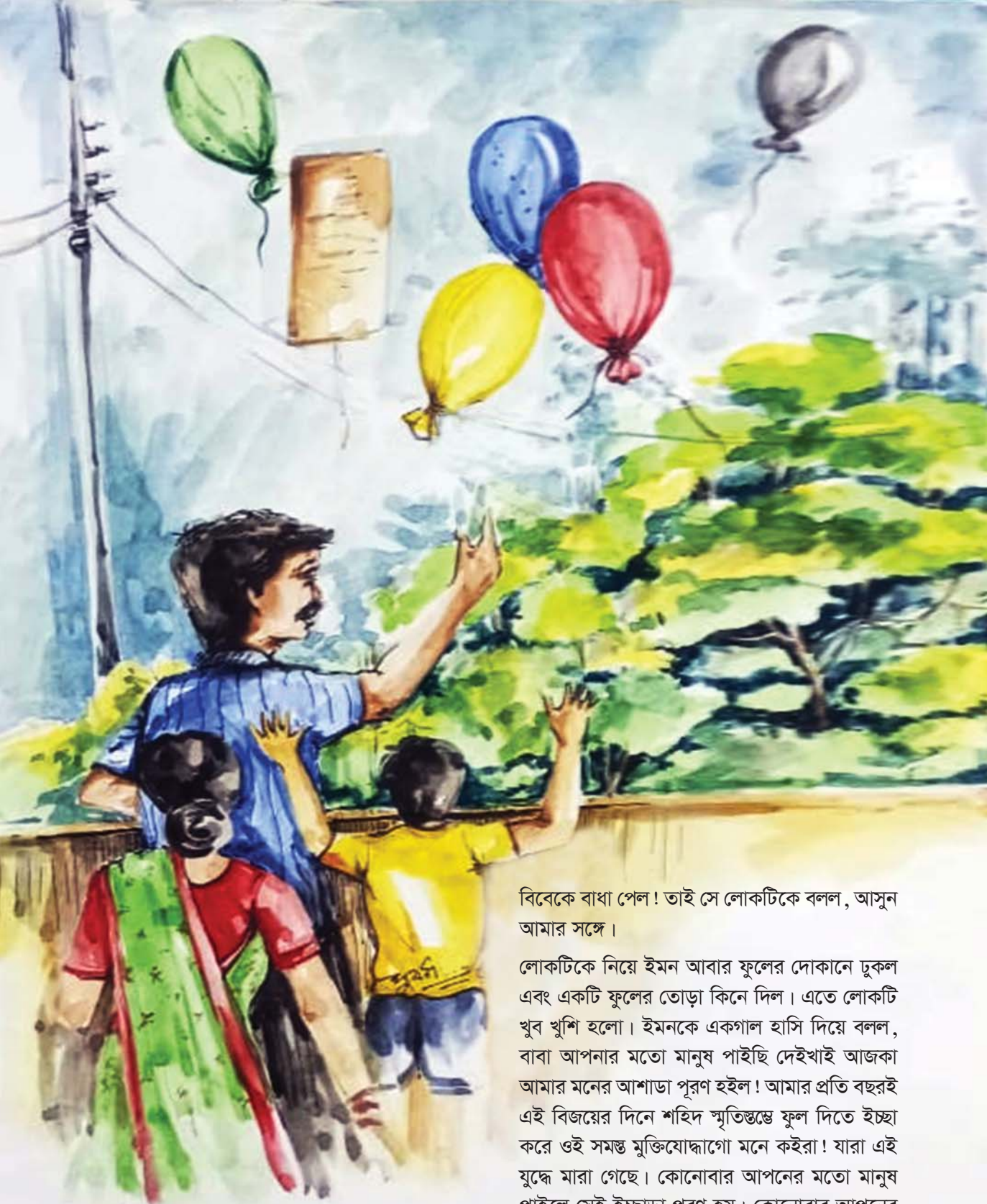

বিবেকে বাধা পেল! তাই সে লোকটিকে বলল, আসুন আমার সঙ্গে।

লোকটিকে নিয়ে ইমন আবার ফুলের দোকানে ঢুকল এবং একটি ফুলের তোড়া কিনে দিল। এতে লোকটি খুব খুশি হলো। ইমনকে একগাল হাসি দিয়ে বলল, বাবা আপনার মতো মানুষ পাইছি দেইখাই আজকা আমার মনের আশাডা পূরণ হইল! আমার প্রতি বছরই এই বিজয়ের দিনে শহিদ স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিতে ইচ্ছা করে ওই সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাগো মনে কইরা! যারা এই যুদ্ধে মারা গেছে। কোনোবার আপনের মতো মানুষ পাইলে সেই ইচ্ছাডা পূরণ হয়। কোনোবার আপনের

মতো মানুষ না পাইলে সেই ইচ্ছা পূরণ করতে পারি না! মনে দুঃখডা থাইক্যা যায়।

ইমন লোকটির এত বড়ো উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখে বলল, আপনি প্রতি বছর বিজয়ের এই দিনে আমার সাথে এসে যোগাযোগ করবেন। আমিই আপনাকে ফুল কিনে দিব শহিদ স্মৃতিস্তম্ভে দেবার জন্য।

ইমন লোকটিকে নিজের ঠিকানা দিয়ে দিল প্রতি বছর তার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। এতে লোকটি আরও খুশি হলো! তারপর শোয়েব আর সানিকে নিয়ে ইমন বোনের বাসায় চলে এল।

বাসায় এসে আপাকে বলল, দেখ আপা, বিদেশে থেকে টাকার পিছনে ছুটতে ছুটতে নিজ দেশের বিজয় দিবসের কথা ভুলে গেছি! এক বৃদ্ধ গরিব লোক আমাকে সেই দিনটির কথা আজ স্মরণ করিয়ে দিল! এতে আমার ভীষণ লজ্জা হচ্ছে। চলো আপা, শোয়েব আর সানির জন্মদিনটা আমরা এই বিজয় দিবসের দিনেই পালন করি। ওরা তো ১৭ই ডিসেম্বর ভোর পাঁচটায় জন্মগ্রহণ করেছে। এক দিনের আগে-পিছে আর কী হবে? ওদের নিয়ে আমি বিজয় দিবসের সকালে শহিদ স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিতে যাব। তারপর দুপুরে ভালো খাবারের ব্যবস্থা করব। বিকেলে কেক কেটে ওদের বন্ধুদের দাওয়াত করে খাওয়াবো। আর সঙ্গে থাকবে বিজয় দিবসের দেশাত্ববোধক গান। এতে দুটো কাজ-ই হবে! বিজয় দিবস উদযাপনও হবে! আবার ওদের জন্মদিনও পালন হবে! কী বলো আপা?

ইমনের কথা শুনে আপা বলল, আচ্ছা কী ঘটনা হয়েছে বল তো? যার জন্য তুই শোয়েব সানির, জন্মদিন আর বিজয় দিবস একই দিনে পালন করতে চাইছিস?

ইমন তখন আপাকে সেই বৃদ্ধের ঘটনাটি খুলে বলল।

আপা তখন বলল, তুই বিদেশ থেকে এসেছিস। তোর মতের মধ্যে আবার বাধা দেওয়া যায় নাকি? তাছাড়া তোর দুলাভাইয়েরও ইচ্ছা বিজয় দিবসটি উদযাপন করা। তাহলে চল কালকেই বিজয় দিবসের দিনে ওদের জন্মদিনটি পালন করি।

আপা ইমনের কথায় রাজি হওয়াতে ইমন খুবই খুশি হলো এবং বলল, অনেকদিন পর দেশে ফিরে একসঙ্গে শোয়েব ও সানির জন্মদিন পালন এবং বিজয় দিবস উদযাপন করতে পারব বলে আজ আমার খুশিতে মনটা ভরে উঠেছে!

ইমন তখন আনন্দে শোয়েব আর সানিকে তার দু'হাতের ভিতরে জড়িয়ে ধরল! শোয়েব আর সানিও খুশি হয়ে ইমনকে জড়িয়ে ধরল! ❑

প্রাবন্ধিক, গল্পকার ও সাংবাদিক

বিজয়ের গান

সারমিন চৌধুরী

লাখো প্রাণের বিনিময়ে
বিজয় এল ঘরে,
মায়ের কান্না মুক্তা হয়ে
ঘাসের বুকে ঝরে।

লাল-সবুজের ওই পতাকা
ঊর্ধ্ব শিরে ওড়ে,
বীর শহিদের বলিদান
থাকে হৃদয় জুড়ে।

বিশ্ব দরবারে বুক ফুলিয়ে
বলতে পারি কথা,
স্বর্ণাক্ষরে বাঁধানো হলো
এই বিজয়ের গাথা।

ডিসেম্বরের ষোলো তারিখ
বিজয়ের গান গায়,
ফুল হাতে ভোরে
সবাই স্মৃতিসৌধে যায়।

গল্প

কিশোর যোদ্ধা

সুজন সাজু

মনের মাঝে ভয় আর আতঙ্ক। চারিদিকে যুদ্ধের পরিস্থিতি বিরাজ করছে। অনেকেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কথাও ভাবছে। আবার অনেকে নিজেদের রক্ষা করার কৌশল খুঁজছে। অনাবিল মাত্র কৈশোরে উত্তীর্ণ বালক। বয়স ষোলো কী সতেরো হবে সর্বোচ্চ। দুই ভায়ের মধ্যে ছোটো অনাবিল।

প্রাইমারি স্কুল শেষ করে আর যাওয়া হয়নি হাই স্কুলে। বয়স্ক বাবাকে সাহায্য করতে লেগে গেছে কৃষিকাজে। কৃষি কাজই তাদের আয়ের মূল উৎস। বাবার সাথে কাজ করেই দিনের সময় পার হয়ে যায় অনাবিলের। মাঝে মধ্যে বাবার অনুমতি নিয়ে সমবয়সিদের সাথে খেলতে যায়। এভাবেই দিন চলে যায় অনাবিলের।

এরই মধ্যে শুরু হলো যুদ্ধের ডামাডোল। দেশকে স্বাধীন করতে হবে। এ ধরনের মানসিকতা তৈরি হচ্ছে ছোটো-বড়ো সকলের মাঝে। অনাবিল বাবাকে বলে, বাবা আমিও যুদ্ধে যাবো। প্রথম দিকে বাবা ভয়ে না করেছে, সাথে মাও। কিন্তু অনাবিল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে রাজি। পাড়ার আশপাশে আরো অনেকে মনস্থির করেছে সবাই পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বে।

এদেশ আমার। এদেশ আমার মাতৃভূমি। মাতৃভূমি রক্ষায় জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত। অনাবিলের বাবা জানতে পারে পাক বাহিনীর সাথে দেশীয় রাজাকার আলবদর সামস মিলে দেশের ক্ষতিসাধন করছে। জনগণের উপর আক্রমণ করছে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠনে সক্রিয় হয়ে উঠছে ওরা। তখন আর বাঁধা না দিয়ে বরং উৎসাহিত করলেন অনাবিলকে।

স্থানীয় কমান্ডার আবুল বশরের নেতৃত্বে যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে চলে গেলেন অনাবিল। স্থানীয় রাজাকারেরা খবর পেল। কিশোর অনাবিল যুদ্ধে অংশগ্রহণের নিমিত্তে ট্রেনিং নিতে গিয়েছে। এর কয়েকদিন পর ওদের বাড়িতে রাতের আঁধারে হামলা করে। লুটপাট করে মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে যায়। যাবার সময় শাসিয়ে যায়, দুই দিনের মধ্যে বাড়ি না ছাড়লে

জানে মেরে ফেলবে। উপায়ান্তর না দেখে পালিয়ে যায় অনাবিলের পরিবার।

এতদিনে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে যুদ্ধের হামলাও প্রতি হামলা। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা হামলার পন্থা অবলম্বন করল। তার কারণ মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে দেশীয় ছোটোখাটো অস্ত্র। সাথে পাক বাহিনীকে রাজাকারদের সহযোগিতা করার ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করছে।

সরাসরি যুদ্ধ করার মতো অস্ত্র এখনো মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে পৌঁছায়নি। যার যা কিছু আছে তা দিয়েই আত্মরক্ষার কৌশল ও সুযোগ বুঝে হামলায় অংশ নিচ্ছে। ধীরে ধীরে মুক্তিযোদ্ধাদের দল ভারি হচ্ছে নতুন সদস্য যুক্ত হওয়ার ফলে। ট্রেনিং শেষে অনাবিলও যোগ দিল স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের দলে। অনাবিল ছোটো হওয়াতে ওকে সরাসরি হামলায় অংশ না নিয়ে পাগল বেশে তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দিল।

গ্রামে কৃষিকাজ করার সুবাধে রাস্তাঘাটও ভালো জানাশোনা আছে। তবে নিজের গ্রামে রাজাকারেরা চিনতে পারে বলে আশেপাশের গ্রামেই বেশি থাকে অনাবিল। একদিন জানতে পারল এখলাছ চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ওদের বাড়িতে হামলা করা হয়। মা-বাবাকে ভয় দেখানোর ফলে সবাই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কোথায় গেছে তা জানে না। এখন এদের খোঁজ করাও সম্ভব নয়। এর ফলে জেদ কাজ করে অনাবিলের মনে।

কমান্ডারকে বলে যেই করে হোক আগে আমাদের প্রধান শত্রু এখলাছ চেয়ারম্যানকে খতম করতে হবে। প্রয়োজনে আমি একাই হামলা করব। শুনে কমান্ডার আবুল বশর একটু সময় নিতে বলে। অভয় দিয়ে বলে- রাখো, কী করা যায় দেখি। তুমি এদের গতিবিধির নজর রাখো। এরাই গ্রামে বেশি অত্যাচারে লিপ্ত। ওকে শেষ করতে পারলে আমাদের জন্য ভয়টাও অনেকাংশে কমবে।

এই পর্যন্ত গ্রামে যত হামলা হত্যার ঘটনা ঘটছে সবই এর ইশারায়। একে খতম করার পন্থা বের করতে হবে সর্বাগ্রে। গোপন মিটিং-এ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে এমন বার্তা দিল কমান্ডার। যে যার মতো করে কাজে নেমে পড়ল।

সবচেয়ে বেশি তৎপর অনাবিল। এর মধ্যে একজন খবর দিল আজ রাতে পাক বাহিনীর সহযোগিতায় এখলাছ চেয়ারম্যান গ্রুপ গ্রামের সবচেয়ে বড়ো পাড়া সওদাগর বাড়িতে হামলা করে লুটপাট করবে। এদের কাউকে বলাবলি করতে শোনা গেছে লুটপাট শেষে পুরো বাড়ি আগুনে জ্বালিয়ে দেবে। এই খবর দ্রুত পৌঁছালো কমান্ডার আবুল বশরের কানে। আজকেই ব্যবস্থা নিতে হবে যে-কোনো উপায়ে।

নিরিবিলি একটি বাড়ির পুরনো ভাঙাচোরা এক গোয়াল ঘর। ওখানে কমান্ডারের নেতৃত্বে গোপনে একত্রিত হলো মুক্তিযোদ্ধারা। অনাবিল আগ্রহী হয়ে আছে তার উপর কী দায়িত্ব পড়ে। কমান্ডার পরিকল্পনামতো দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয় একেক জনকে। অনাবিলের দায়িত্ব পড়ল সওদাগর বাড়ির আশেপাশে কোনো স্থানে আড়ালে লুকিয়ে থাকা। যখন টের পাবে কেউ হামলা করতে আসছে দ্রুত খবরটা ক্যাম্পে জানানো।

যে যার মতো প্রস্তুতি নিতে লাগল। অনাবিলও তার জায়গা বেছে নিল কমান্ডারের নির্দেশ মতো। ঘনিয়ে এল সন্ধ্যা। প্রস্তুত রয়েছে ছোটো-বড়ো সকল মুক্তিযোদ্ধা। হামলা করতে আসলেই ঝাপিয়ে পড়বে শত্রুর উপর। ধীরে ধীরে রাতের আঁধার বাড়তে থাকে। পড়ছে শীতের ঠান্ডা। আক্রমণে এগিয়ে এল মশার দলও। তবুও নড়াচড়া নেই কারো। হঠাৎ সংকেত পাঠালো অনাবিল।

দুইজন অপরিচিত লোক বাড়িঘাঁটায় প্রবেশ করে এদিক-সেদিক তাকিয়ে ফের চলে গেল। বুঝতে অসুবিধে হলো না এরা এখলাছ চেয়ারম্যানের লোক। হামলার স্থানে পরিস্থিতি নিজেদের জন্য নিরাপদ কিনা পর্যবেক্ষণ করা। কিন্তু বোকা রাজাকারের দল জানতে পারেনি প্রস্তুত আছে মুক্তিযোদ্ধারা।

নিশির মাঝামাঝি পাক বাহিনীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে রাজাকারের দল। সওদাগর বাড়ির মূল রাস্তায় প্রবেশ করতেই ঘিরে ফেলল চারিদিক থেকে মুক্তিযোদ্ধারা। উভয় দলের মধ্যে গোলাগুলির তীব্র হামলা পালটা হামলা। প্রায় দুই-তিন ঘণ্টার বিরতিহীন লড়াইয়ে বেশিরভাগ পাক ও রাজাকারের দলের সদস্য নিহত হলো। নিহতের মধ্যে রয়েছে রাজাকার এখলাছ চেয়ারম্যানও।

মুক্তিযোদ্ধাদেরও অনেকে আহত হয়েছে। শহিদ হয়েছে একজন মুক্তিযোদ্ধা। আহত হয়েছে অনাবিলও। পায়ের ক্ষতটা আজীবনের জন্য পঙ্গুত্বের। গুলিতে ঝাঁঝড়া হয়ে গেল ডান পা। এত কষ্টের মাঝেও রাজাকার এখলাছ চেয়ারম্যানকে শেষ করে দিতে পেরেছে এটাই বড়ো প্রাপ্তি। অনাবিল চিকিৎসা নিতে নিতে শুনতে পেল দেশ বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে। এর কিছুদিন পর ডিসেম্বরের ষোলো তারিখ এল কাঙ্খিত সেই বিজয়। ❑

শিশুসাহিত্যিক

মুক্ত ময়না

মাশ্‌হুদা মাধবী

উনিশশ সত্তরের কার্তিকে অতলকে নক্ষত্র নিজেদের বাড়িতে নিয়ে এল প্রথমবার। নক্ষত্রের বাড়িতে পোষা ময়না দেখে অতলের সাধ হয় সে মাকে উপহার দেবে এমন লক্ষ্মী ময়না। পাখিটা মাকে ডাকবে। সে পড়াশোনার জন্য ঢাকায় থাকে এখন। মা তাকে ছুটি ছাড়া কাছে পায় না। নক্ষত্র আশ্বাস দিয়েছিল, 'আচ্ছা, তোকেও একটা পাখি এনে দেবে অরুদা। পাহাড় ঘেঁষা মেঘালয় রাজ্যের বন বনানিতে নাকি কত পাখি থাকে। ধর, সেটা হলো গিয়ে পাখিদের মুক্ত স্বাধীন দেশ।'

অতল যখন এল মেঘালয় থেকে আনা ময়নাটাকে সবে দিয়ে গেছে নক্ষত্রের প্রিয় অরুদা। মিষ্টি সুরে ডাকে বাড়ির নতুন অতিথিটা! এরপর নক্ষত্র শুরু করল ময়নাকে কথা শেখানো, 'ময়নাকে খেতে দাও মা। বাবা, নক্ষত্র কোথায়' ? আরও কত কথা। ময়নাকে

কথা শেখানোর এক কঠিন অভিযান শুরু করে নক্ষত্র।

ইট রঙের টালি ছাওয়া টানা বারান্দা, সিমেন্টের দেয়াল, কালো মেঝের ছিমছাম বাড়িটার গাছে গাছে সারাদিন পাখিদের ওড়াওড়ি, কলকাকলি। বিষণ্ন উদাস চোখে বাঁশের খাঁচার ভেতর থেকে ময়নাটা আনমনে শীষ দেয়। ঘাড় ঘুরিয়ে স্বাধীন উড়ে বেড়ানো বন্ধুদের দেখে বিষণ্ন চোখে।

অতল আর নক্ষত্রের বন্ধুত্ব হয়েছিল একই ক্লাসে পড়ার সূত্রে। অবসরে পাড়ার মাঠে ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন খেলার বিকেল, বর্ষাবাদলে ঘরে বসে লুডু, ক্যারাম, বাগাডুলি খেলার আনন্দময় দিনগুলো। সব ছেড়ে বাবার বদলির কারণে ক্লাস সেভেনে উঠে নক্ষত্ররা চলে গেল। নক্ষত্রদের ট্রেনটা হুইসেল বাজিয়ে প্লাটফর্ম ছেড়ে দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে গেলে চোখ মুছতে মুছতে বাবার সাথে ফিরে এল অতল। বন্ধু বিচ্ছেদে মন খারাপ। ব্রিটিশ আমলে তৈরি লাল রং দোতলা রেল কোয়ার্টারটাতে নক্ষত্র নেই সে তা ভাবতে পারে না ।

স্টেশনে ওভারব্রিজের সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ইচ্ছামতো বারবার ওঠানামার মধুর দিনগুলো হারিয়ে গেল। একে অন্যের বাড়িতে মায়েদের তৈরি পিঠা, পায়েস, রসগোল্লা, দই, ছানার জিলিপি, নিমকি খাওয়াদাওয়া এখন কেবলই স্মৃতির খাতায় আঁকা অপূর্ব ছবি। এরপর শুধু চিঠিতেই তাদের যোগাযোগ। ডাকপিয়ন চিঠি পৌঁছে দিলে চটপট উত্তর দেয়,' প্রিয় বন্ধু, তোর সব খবর জেনে ভালো লাগল'। দুজনেই দুই ঈদে ঈদকার্ড পাঠায় বুকপোস্টে। ক্লাস এইটে ভালো ছাত্র দুজনেই জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দেবে, তাই পড়াশোনার চাপে বন্ধ হলো চিঠি আদান-প্রদান।

ক'বছর পর আচমকা দেখা ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট কেমিস্ট্রি ক্লাসে প্রথম দিন। হোস্টেলেও তাদের রুম একই ব্লকে হওয়ায় তারা মহাখুশি। নক্ষত্ররা তাদের পূর্ব পুরুষের বাসস্থান নেত্রকোনা সোমেশ্বরী নদীর দেশে থাকে এখন।

সোমেশ্বরী নাম ভারি পছন্দ অতলের। শুনে নক্ষত্র বলে, 'হুম, তোকে সোমেশ্বরী দেখাবোরে।'

এবার নক্ষত্রের প্রস্তাব দুজনে বিরিশিরি, সোমেশ্বরী, সাগর দিঘিও ঘুরে আসবে। মজা করে নক্ষত্র, 'হুমম,

মগড়া নদীও দেখবি নাকি? আড়িয়াল খাঁ? 'দুই কিশোর হো হো হাসে।

কলেজ ছুটিতেও দুজনের চিঠি লেখালেখি চলে, সাথে বাড়িতে আসা যাওয়াও। কিছুদিন আগে অতলের আমন্ত্রণে নিরিবিলি সেই শহরে এসেছিল নক্ষত্র। দুজনে মিলে শহরময় ঘুরে বেড়ানোর ক'টা দিন স্টেশন, রেললাইন, ওভারব্রিজ, সাহেব পাড়া, বাবুপাড়ায় পুরনো বন্ধুদের সাথে আনন্দে খুশিতে কাটিয়ে ফিরে গেল নক্ষত্র।

ঢাকা থেকে ট্রেনে বাহাদুরাবাদ ঘাট। অনেকটা পথ হেঁটে স্টিমারে ওঠা। গম্ভীর ভেঁপু বাজিয়ে স্টিমার যমুনা পেরিয়ে ফুলছড়ি ঘাটে পৌঁছালে কিছুটা হেঁটে নির্দিষ্ট ট্রেনটিতে ওঠা। লালমনিরহাট আসা-যাওয়া ধকলের। অতলও অনেক দুর্গম পথ পেরিয়ে দুর্গাপুর এল আবার। এবার ময়না পাওয়ার আশা।

দ্বিতীয়বার এসে দেখে এই চার-পাঁচ মাসে নক্ষত্রের ময়নাটা বেশ কথা শিখেছে। অতলকে দেখেই কলা খাওয়া বন্ধ করে তার হাঁকডাক শুরু হলো, 'মা, ওমা, খেতে দাও বন্ধুকে।' গানও গায়, ঢাকা রেডিওর কমার্শিয়াল সার্ভিস শুনে বিজ্ঞাপনের কত গান মুখস্ত তার। কথাও যা মজার। কিন্তু তার ময়নাটা? নক্ষত্রের আশ্বাস, 'ওরে, পাবি। অরুদার পাখি ঘরে আপাতত ময়না নেইরে, এনে দেবে ক্ষণ।'

ময়না পাবার আশায় দুই দিন কেটে গেল, অরুনদার দেখাই নেই। অতলের বাড়ি ফেরাও জরুরি। বয়স্ক দাদিমা, অসুস্থ বাবাকে নিয়ে স্থানীয় স্কুল শিক্ষক মা তার জন্য চিন্তায়। কলেজে ক্লাস বন্ধ হওয়ায় নক্ষত্রের সাথে ঝোঁকের বশে চলে এসেছে। ময়না সাথে গিয়ে মাকে চমকে দেবার ইচ্ছেতেও কিছুটা। নক্ষত্রদের বাড়িতে যাচ্ছে চিঠি লিখে জানানোর সুযোগ হয়নি। একই শহরের ছেলে রুমমেটকে অবশ্য বলেছে গিয়েই বাড়িতে খবর দেবে। এখান থেকে খবর দেওয়া ভীষণ ঝামেলার ব্যাপার। টেলিগ্রাম, টেলিফোন, পোস্ট অফিস বেশ দূরে। রাস্তা, যোগাযোগ ব্যবস্থা অসম্ভব খারাপ। আর চিঠি ? সেটা পৌঁছার আগে সে-ই ফিরে যাবে। অন্তত তিন-চার দিন লাগে চিঠি পৌঁছাতে।

অবশেষে অরুদার খবর নিতে গ্রাম ঘেঁষে তাদের বাড়ি যাওয়া। উঠোনের কোণে করবী, কাঞ্চন বক ফুলের গাছ। মাটির হেঁসেলের খড়ের চালে ক'টা বড়োসড়ো পাকাপোক্ত সাদা চালকুমড়া। মায়ের বানানো চাল কুমড়ার মোরব্বা অতলের কাছে অমৃত।

কিন্তু হায়রে! বাড়িতে অরুনদাই নেই। কাকি বলেন, 'ঘুরে বেড়ানো আর পাখির নেশা ছেলেটার। আজ ডাউকি নদীর তীরে পাখিদের দেশ চিম্বুক পাহাড়ে যাওয়া চাই। কদিন আগে পাড়ার অরিত্রকে নিয়ে বন পাহাড়ে গেছে। এসে পড়বে আজকালের মধ্যে। ঘুরে বেড়ানো স্বভাব তার ঠাকুরদার কাছে পেয়েছে'। ঠাকুরদা এই অঞ্চলের জনপ্রিয় স্কুলশিক্ষক সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ কাব্যতীর্থ পাখিবাবুরও পাখির নেশা ছিল। অরুদারও তেমন।

খই দিয়ে তৈরি মোয়া, তিলের নাড়ু, নারকেলের সাদা ধবধবে সন্দেশ পেতলের রেকাবি ভর্তি করে দুজনের সামনে গোলাকার টুলের উপর রাখলেন কাকি, 'মুখে দাও দিকি বাছারা।' দারুণ সুস্বাদু নাশতা পেট পুরে খেয়ে বিদায় নেয় ওরা। কাকা সস্নেহে বললেন,' আবার এসো বাবারা।' তখন দিন শেষে ওদের মাথার উপর দিয়ে ডানা ঝাপটে ফিরছে বাদুড়ের দল, বাড়ির বাগানের বাইরে ঝাঁকড়া গাছে মাথা নিচে ঝুলিয়ে তারা ঘুমায়। তখন ঝিঁঝিদের কোরাস, বৃন্দগান মুখর আশ্বিনের নিঝুম সন্ধ্যা মেঠোপথে নুয়ে পড়েছে। অসংখ্য জোনাকি প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো গায়ে মেখে বাড়ি ফিরতে রাত গাঢ়ই হলো। চিন্তিত চাচিকে দেখা যায় অপেক্ষায় জানালায় দাঁড়িয়ে। রাতে লাল চালের গরম ভাত, বেগুন ভাজা, আলু ভর্তা আর রাজহাঁসের গোশত চকচকে কাঁসার থালায় সযত্নে বেড়ে দেন খালা। নক্ষত্রের স্কুলে পড়া ছোটো দুই ভাইবোনসহ একসঙ্গে খেয়েদেয়ে সোজা বিছানায়। তখন বাইরে শেয়ালের হুক্কাহুয়া, নিশাচর পাখির ডাক। ঘরের টিনের চালে শিশির ঝরার টুপটাপ শব্দ শুনতে শুনতে নানা রঙের সুতোয় ফুল, পাতা, পাখির নকশা তোলা পুরোনো শাড়ির নরম কাঁথার উমে গভীর ঘুমের দেশে দুই সুবোধ কিশোর।

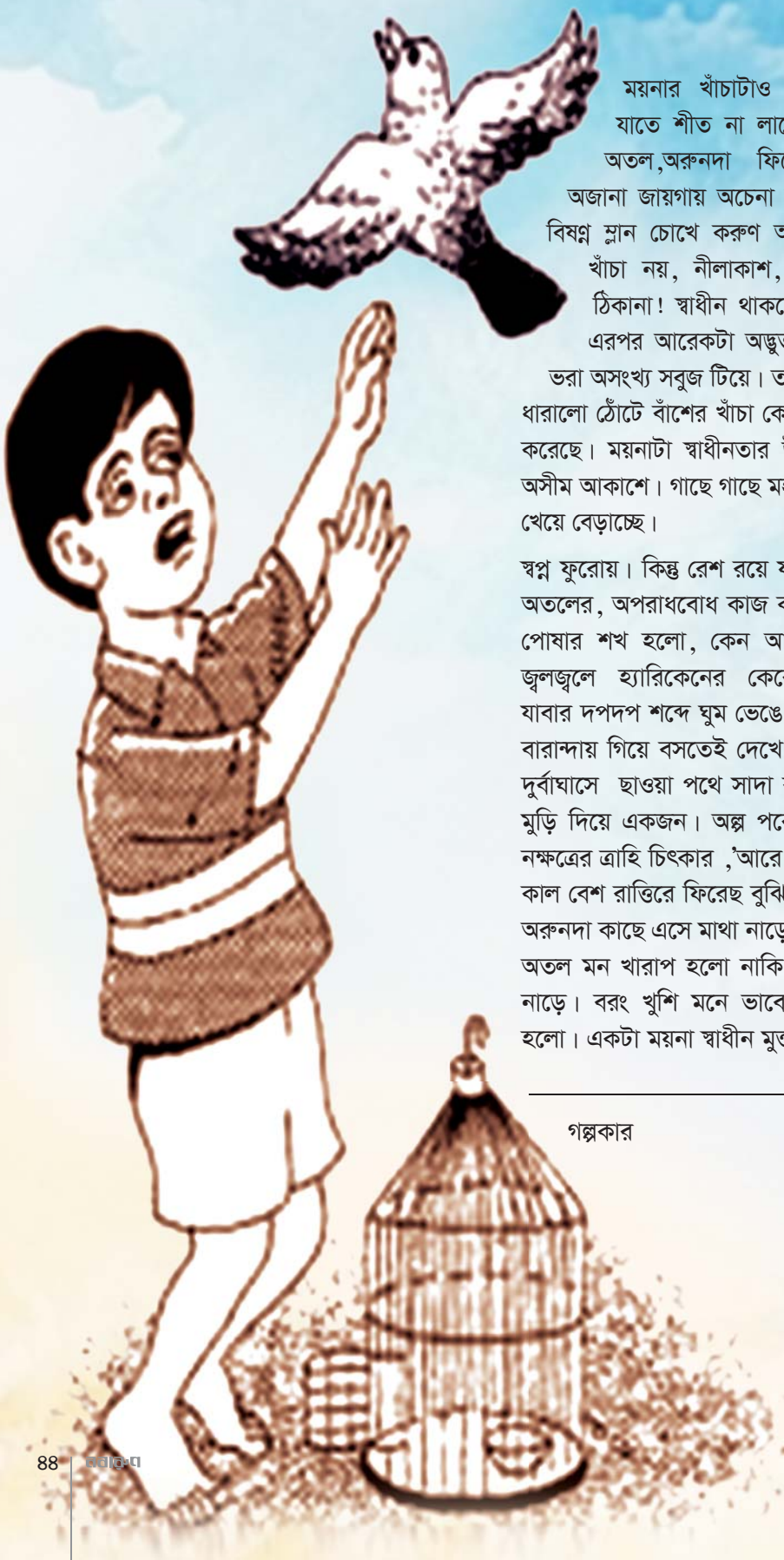

ময়নার খাঁচাটাও মোটা কাপড়ে ঢাকা যাতে শীত না লাগে। রাতে স্বপ্ন দেখল অতল,অরুনদা ফিরেছে ময়না নিয়ে। অজানা জায়গায় অচেনা মানুষের মাঝে ময়নার বিষণ্ন ম্লান চোখে করুণ আকুতি। যেন বলছে,' খাঁচা নয়, নীলাকাশ, সবুজ অরণ্য আমার ঠিকানা! স্বাধীন থাকতে চাই, ছেড়ে দাও!' এরপর আরেকটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল, আকাশ ভরা অসংখ্য সবুজ টিয়ে। তারা এসে টুকটুকে লাল ধারালো ঠোঁটে বাঁশের খাঁচা কেটে বন্দি ময়নাকে মুক্ত করেছে। ময়নাটা স্বাধীনতার উচ্ছল আনন্দে উড়ছে অসীম আকাশে। গাছে গাছে মহানন্দে ইচ্ছেমতো ফল খেয়ে বেড়াচ্ছে।

স্বপ্ন ফুরোয়। কিন্তু রেশ রয়ে যায়। মনটা হু হু করে অতলের, অপরাধবোধ কাজ করে। কেনই বা ময়না পোষার শখ হলো, কেন আনতে বলল? রাতভর জ্বলজ্বলে হ্যারিকেনের কেরোসিন শেষ। নিভে যাবার দপদপ শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে। আবছা ভোরে বারান্দায় গিয়ে বসতেই দেখে ঘন কুয়াশা মোড়ানো দুর্বাঘাসে ছাওয়া পথে সাদা রঙের চাদরে গা মাথা মুড়ি দিয়ে একজন। অল্প পরেই অবয়ব স্পষ্ট হলে নক্ষত্রের ত্রাহি চিৎকার ,'আরে, অরুদা, এত্ত ভোরে? কাল বেশ রাত্তিরে ফিরেছ বুঝি? তা ময়না কই গো?' অরুনদা কাছে এসে মাথা নাড়ে,'নাহ, পাইনিরে। তা অতল মন খারাপ হলো নাকি?' অতল নীরবে মাথা নাড়ে। বরং খুশি মনে ভাবে, একটুও নয়। বেশ হলো। একটা ময়না স্বাধীন মুক্ত রইল। ❑

গল্পকার

পতাকা

তোহা ইসলাম

আকাশ পানে উড়ছে
লাল-সবুজ পতাকা,
হৃদয় মাঝে রাখব ধরে
মুছে যেতে দেবো না।

লাখো শহিদের বুকের রক্তে
পেয়েছি এমন দেশ
প্রাণের চেয়ে প্রিয়
আমার সোনার বাংলাদেশ।

সপ্তম শ্রেণি, আল কাউসার স্কুল, কুমিল্লা

স্বাধীন পতাকা

মেহেদী হাসান হৃদয়

পতাকা আজ উড়ে চলে,
গৌরব আনে সবার তরে।
শিখে নাও সেই ইতিহাস,
সাহসী মন করছে উল্লাস।

লক্ষ প্রাণ গেল ঝরে,
বিজয় এল রঙিন ভোরে।
বিজয়ের এই মহান দিনে,
শ্রদ্ধা জানাই সবাই মিলে।

আজকে আমরা যে স্বাধীন,
তাদের দানে পূর্ণ দিন।
ধরতে হবে হাতে পতাকা,
বাঁচিয়ে রাখতে ভালোবাসা।

দশম শ্রেণি, খুরশিমুল উচ্চ বিদ্যালয়, মোহনগঞ্জ

স্বাধীন দেশে

আনোয়ার দিপু

নয় মাস যুদ্ধ শেষে,
পেলাম বাংলাদেশ।
পাক সেনাদের হারিয়ে,
মুখে হাসি এল বেশ।

দেশ মাতৃকাকে বাঁচাতে গিয়ে,
রক্ত দিল যারা হেসে
আমৃত্যু তাঁদের যাবো
হৃদয় দিয়ে ভালোবেসে।

শিশুরা আজ গর্ব করে,
এই ইতিহাস মনে ধরে।
স্বাধীন দেশে হেসে খেলে,
মনে খুশির ঢেউ তুলে।

নবম শ্রেণি, রহিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোণা

গল্প

মুক্তিযোদ্ধার গল্প

মাহমুদুল হাসান খোকন

সুখ পঞ্চম শ্রেণির মেধাবী ছাত্র। এবার সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। তিন সপ্তাহ আগে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। বেশ ভালো দিয়েছে পরীক্ষা। সুখের বাবা কুরবান আলী একজন দাখিল মাদরাসার সিনিয়র সহকারী শিক্ষক। দুই সন্তানের পিতা তিনি। ছোটো ছেলে সুখ। ভালো নাম জুবায়ের বিন কুরবান। আর সুখের বড়ো বোন সোহাগি, ভালো নাম হলো মাইমুনা বিনতে কুরবান। মা মমতা বেগম। পেশায় গৃহিণী। এলাকায় একটি আদর্শ পরিবার হিসেবে বিশেষ পরিচিত কুরবান আলির পরিবার। সবাই খুব ভালো বলেই জানে। সোহাগি গত দু'বছর আগে এবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্থানীয় এক নুরানি ও হিফজ মাদরাসায় হিফজ বিভাগে অধ্যয়নরত। কুরবান আলির মাদরাসার বার্ষিক পরীক্ষা শেষ।

সোহাগির মাদরাসাও বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বন্ধ দিয়েছে। তাই সোহাগি বাড়ি এসেছে। রাতের খাবার শেষ হলে পরিবারের চার সদস্য বসে নানান কথ াবার্তা বলছে। সোহাগি ছোটো হবার কারণে বাবাকে একপর্যায়ে জিজ্ঞেস করে, বাবা! বিজয় দিবস কী? আপনার মাদরাসাও কি এ দিবসের জন্য বন্ধ?

-হ্যাঁ মামণি।

বিজয় দিবস কী? আবারো বলল সোহাগি।

বাবা জবাবে বলল, বিজয় দিবস আমাদের বাংলাদেশের একটি বিশেষ ও স্মরণীয় দিন। আগামী পরশুদিন ১৬ই ডিসেম্বর। আমার মাদরাসায় বিজয় দিবসের ওপর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। এর উপর আমাদের মাদরাসায় তিনজন সিনিয়র শিক্ষকের মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা আলোচনা করবে। এই তিনজন সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধা ১৯৭১ সালে হানাদার বাহিনীর সাথে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। যার কারণে মুক্তিযোদ্ধারা এদেশের সেরা সন্তান। চাইলে তুমি আমার সাথে যেতে পারো। বিজয় দিবসের আলোচনাটি তোমার ভালো লাগবে এবং অনেক কিছু জানতে পারবে।

বিজয় দিবসের দিন সকাল সকাল কথামতো সোহাগি ও সুখকে সাথে নিয়ে তার বাবা কুরবান আলি মাদরাসায় যথাসময়ে হাজির হন। সকাল প্রায় ১০.০০টা বাজে। এর মধ্যেই সবাই হাজির। প্রতিদিনের ন্যায় আজও সকল ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক- স্টাফরা সবাই এসেছে। জাস্ট দশটায় শুরু হলো। মাদরাসার যে-কোনো অনুষ্ঠান যথাসময়ে শুরু হয়। এটা মাদরাসার একটি সেরা বৈশিষ্ট্য। ফলে গভর্নিং বডির সব সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত হয়েছেন।

সুপার হুজুর সাহেব নিজেই উপস্থাপনা করেন বরাবরের মতো। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করার জন্য আহ্বান জানানো হলো মাদরাসার দশম শ্রেণির এক মেধাবী ও হাফেজ ছাত্র আনোয়ার হোসেনকে। অত্যন্ত সুন্দর সুরে ও সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করল ছাত্রটি। সুপার হুজুর উদ্‌বোধনী বক্তব্য শেষে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ খয়বর আলিকে তার অভিজ্ঞতা আলোচনার জন্য আহ্বান জানান। খয়বর আলি সাহেব তার অভিজ্ঞতা থেকে খুব সুন্দর উপস্থাপন করলেন। তারপর আহ্বান জানানো হলো বীর মুক্তিযোদ্ধা রমজান আলীকে। তিনিও তার অংশগ্রহণমূলক অভিজ্ঞতা জানালেন। সবশেষে আহ্বান জানানো হয় মুহাম্মদ কুরবান আলীকে, তার অংশগ্রহণমূলক অভিজ্ঞতা থেকে বলার জন্য। মুহাম্মদ কুরবান আলি সালাম জানিয়ে ভূমিকা ছাড়াই শুরু করল।

তখন আমার বয়স মনে হয় ১৫ বা ১৬ বছর হবে। দশম শ্রেণির ছাত্র তখন আমরা। মা-বাবার সাথে আমরা দুই যমজ ভাই থাকি। আর কোনো ভাইবোন নেই, চার সদস্যের পরিবার আমাদের। আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালোই চলছে আমাদের ছোটো সংসারটি।

১৯৭১ সালের ঠিক মাঝামাঝি সময় থেকে সারা দেশে একযোগে পাকবাহিনীর সাথে অবিরতভাবে যুদ্ধ চলে। যুদ্ধের খবর জানতে পাই আমার মোজাফ্‌ফর চাচার কাছে সেপ্টেম্বর মাসের ২৮ তারিখে। এখনকার মতো আর টিভি ও খবরের কাগজ ছিল না তখন। তাই চাচা আমাদেরকে খবর দিতে ও নিরাপদ দূরত্বে রাখার জন্য রংপুর থেকে ছুটে আসেন কুড়িগ্রামে। তখন আমাদের কুড়িগ্রাম জেলা হয়নি। রংপুর জেলা। চাচার মুখে দেশ স্বাধীনের ভয়াবহ যুদ্ধের কথা শুনে আমার গা শিউরে ওঠে। চাচার পরামর্শক্রমে আমরাও নিতে থাকি যুদ্ধের পুরো প্রস্তুতি। অবশেষে ডিসেম্বরের ১১ তারিখে আমাদের গ্রামে রাতের শেষভাগে প্রবেশ করে পাকসেনারা। যদিও সারারাত জেগে চাচা, বুরহান ও আমি মিলে প্রথমে মা-বাবাকে নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করি যাতে কোনোভাবে তাদেরকে হাতের নাগালে না পায়।

রাতে কোথায় কী হয়েছে তার কিচ্ছু জানি না আমরা। আমরা তিন চাচা-ভাতিজা রাতে ঘুমাইনি। খুব কষ্টে রাতটা জেগে ছিলাম। কিন্তু শেষভাগের দিকে মানুষের অনেক চিল্লানি শোনা যাচ্ছে। কোনদিকে তা ঠিকমতো বুঝা যায়নি। লাঠিসোটা, দা-বটি, কুড়ালই ছিল আমাদের মোক্ষম হাতিয়ার। তা নিয়ে বেশ প্রস্তুতি নিয়ে আছি আমরা। জীবন থাক আর যাক একটা কিছু করব এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে মনে দুরন্ত সাহস সঞ্চয়

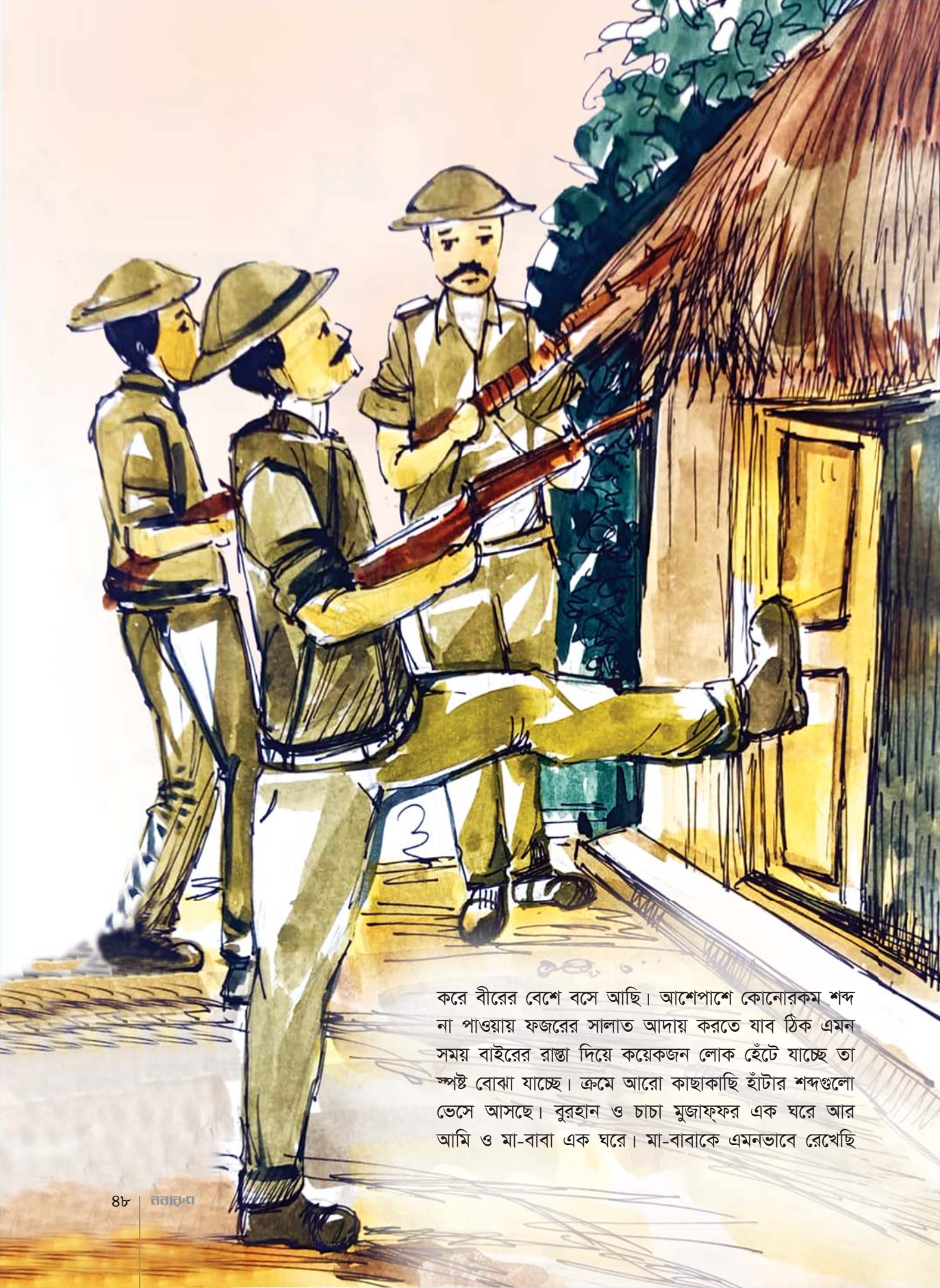

করে বীরের বেশে বসে আছি। আশেপাশে কোনোরকম শব্দ না পাওয়ায় ফজরের সালাত আদায় করতে যাব ঠিক এমন সময় বাইরের রাস্তা দিয়ে কয়েকজন লোক হেঁটে যাচ্ছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ক্রমে আরো কাছাকাছি হাঁটার শব্দগুলো ভেসে আসছে। বুরহান ও চাচা মুজাফ্‌ফর এক ঘরে আর আমি ও মা-বাবা এক ঘরে। মা-বাবাকে এমনভাবে রেখেছি

যে, না বললে কেউই খুঁজে পাবে না তাদের। অপ্রস্তুত অবস্থায় বুরহান ঘরের ভিতর হাঁচি দিয়ে ফেলল দুটি। রাস্তার পাকবাহিনী আঁচ করল যে, ঘরে নিশ্চিত লোক আছে। তাই তারা বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ে। আমি পাশের ঘরে থেকে বাইরে দেখার চেষ্টা করি। দেখতে পেলাম বুরহান ও চাচার ঘরের দরজায় আঘাত করছে চারজন সেনার মধ্যে একজন। বাকিরা দাঁড়িয়ে আছে। অনেক চেষ্টা করছে দরজা ভাঙার জন্য। এদিকে আমি পিছনের গোপন দরজা দিয়ে বের হয়ে আস্তে আস্তে বাড়ির ভিতর ঢুকি পায়ে সেন্ডেল ছাড়াই। যাতে কোনো শব্দ না হয়। এদিকে তারা বুরহানের ঘরের দরজা ভাঙতে সফল হয়। ইতোমধ্যে বুরহান ও চাচা পাকসেনাদের বাড়ির ভিতর ঢুকার শব্দে তারা বুঝে উঠার আগেই আগে থেকে ঘরে তৈরি করে রাখা মাটির সুড়ঙ্গ দিয়ে বের হয়ে আসে। সেনা চারজন ঘরে ঢুকার পর বাইরে থেকে ঘরের শিকল লাগিয়ে দেই। আটকে থাকা চার সেনা বের হবার চেষ্টা করছে। কিন্তু বাইরে থেকে দরজা আটকানো। বের হবার কোনো সুযোগ না পেয়ে ঘরের পাটখড়ির বেড়া ফাঁক করার শব্দ আমি টের পেয়ে আড়ালে চলে গেলাম। পরে আশেপাশে গিয়ে কয়েকজনকে বললাম ঘটনাটি। বললাম চলেন গিয়ে ঘরে আগুন দিয়ে আসি। পরে ঘর দেওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

কথামতো চারপাশ থেকেই একযোগে আগুন ধরিয়ে দিলাম। ওরা একসময় নিস্তেজ হয়ে গেল। শত্রুমুক্ত হলো এ গ্রাম। বাবার মুখ থেকে বিজয়ের মর্মান্তিক এ ঘটনা শুনে চোখে পানি মুছে সোহাগিসহ আরো অনেকে। এরকম আরো অনেক ঘটনা ঘটেছে সারা বাংলায়। এভাবেই পাই আমরা আমাদের বিজয়। এরপর উপস্থিত সকলকে দেশ গঠনে নিজ নিজ জায়গা থেকে ভূমিকা রাখার অনুরোধ করে সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে আলোচনা শেষ করেন সুপার হুজুর। ❑

গল্পকার

সিনথিয়া ইসলাম, ষষ্ঠ শ্রেণি, পয়ালগাছা বহুমুখি উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা

প্রাণীদের মজার তথ্য

জ্ঞান এমন একটা বিষয় যার কোনো সীমা নেই। তাই সবকিছু আমাদের জানা থাকবে না। কিছু বিষয় অজানা থাকাই স্বাভাবিক। তাই জীবনে শেখার কোনো শেষ নেই, তবে বিশ্বাস করতে হবে নিজের বিবেচনায়, অন্যের কথায় নয়। জানতে হবে প্রতিনিয়ত। নিয়মিত গবেষণার ফলে কতই না মজার তথ্য জানতে পারেন বিজ্ঞানীরা। আর তাদের থেকে আমরাও জানতে পারি, শিখতে পারি। নবারুণের বন্ধুরা চলো জেনে নেই প্রাণীদের নিয়ে বিজ্ঞানের কিছু মজার তথ্য–

১. খরগোশ ও তোতাপাখিকে কখনো পেছন ফিরে তাকাতে হয় না। তারা মাথা সোজা রেখেই পেছনের দৃশ্য দেখতে পারে

২. প্রজাপতি কোনো খাবারে বসলেই সে ওই খাবারটির স্বাদ অনুভব করতে পারে। কারণ প্রজাপতির 'টেস্ট রিসেপ্টর' এর পায়ের তালুতে থাকে। আর মানুষের থাকে জিহ্বায়

৩. অনেক অনেক উঁচু থেকে পড়লেও পিঁপড়া কখনও মরে না

৪. তেলাপোকা মাথা ছাড়া ১০ দিন বাঁচতে পারে

৫. বানরের মাথায় দুটি মগজ থাকে। একটি তার দেহ নিয়ন্ত্রণ করে এবং অপরটি তার লেজ নিয়ন্ত্রণ করে

৬. চড়ুই পাখি তার ছানাকে দিনে ৩০০ বার খাওয়ায়

৭. মানুষের হাঁচির বেগ ঘণ্টায় ১৬০ কিলোমিটার

৮. স্টেগাসোরাস ডায়নোসরদের দৈর্ঘ্য ৯ মিটার পর্যন্ত হয়, কিন্তু এদের মস্তিষ্ক একটা আখরোটের সমান

৯. ক্যাঙ্গারু এবং ইমু পাখি পিছনে যেতে পারে না। পায়ের বিচিত্র গঠনের কারণে পিছন দিকে হাঁটতে তাদের ঝামেলা হয়

১০. বিশাল আকৃতির জলহস্তীকে দেখলে বোঝা যায় না যে তারা জোরে দৌড়াতে পারে, কিন্তু এরা মানুষের চেয়েও জোরে দৌড়াতে পারে।

প্রতিবেদন: ফাতেমা আক্তার

শব্দদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব

শব্দদূষণ বলতে মানুষের বা প্রাণীর শ্রুতিসীমা অতিক্রমকারী কোনো শব্দ সৃষ্টিকে বোঝায়। এতে শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যানজট, কলকারখানা থেকে দূষণ সৃষ্টিকারী এ রকম তীব্র শব্দের উৎপত্তি করে। মানুষ সাধারণত ২০ হার্জের কম এবং ২০ হাজার হার্জের বেশি শব্দ শুনতে পায় না।

শব্দদূষণের সামাজিক প্রভাব প্রচণ্ড। স্কুল, কলেজ বা হাসপাতালের পাশে যে শব্দের কারণে কাজের বা পড়াশোনায় মনোযোগ কমে যায়। এ ছাড়া শব্দদূষণের কারণে ক্ষুধামন্দা ও হৃদরোগ হতে পারে। শব্দ মানুষের মস্তিষ্কে সরাসরি আঘাত করে। এতে মেজাজ বিগড়ে যায় এবং অস্থিরতায় ভোগে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ৬০ ডেসিবেল শব্দে সাময়িকভাবে শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়, ১০০ ডেসিবেলে চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে। অথচ রাজধানী ঢাকার অনেক জায়গাতেই শব্দ ১০৭ ডেসিবেল পর্যন্ত ওঠে। শব্দদূষণের অন্যতম উৎস রাজনৈতিক সমাবেশ, ওপেন কনসার্ট, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, হাইড্রোলিক হর্ন, জেনারেটর, ভবন নির্মাণ, শিল্প কারখানা ইত্যাদি।

শব্দদূষণের কারণে দুশ্চিন্তা, উগ্রতা, উচ্চ রক্তচাপ, শ্রবণশক্তি হ্রাস, ঘুমের ব্যাঘাতসহ অন্যান্য ক্ষতিকর ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। এ ছাড়া অন্যান্য শারীরিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে হাইপার টেনশন, স্মরণশক্তি হ্রাস, মানসিক অবসাদ ইত্যাদি হতে পারে। শব্দদূষণের কারণে অনেক মানুষ বধির হয়ে যাচ্ছেন। ফলে তিনি যে কাজটা করতেন, সেটা করতে পারেন না।

পরিবহণ সেক্টরের শব্দ নিয়ন্ত্রণ, সঠিক নগর পরিকল্পনা, জোনিং কোডের ব্যবহার, রাস্তার শব্দ নিয়ন্ত্রণ, শব্দ হ্রাসকারী স্থাপত্য নকশা ও বিমানের শব্দ প্রশমনে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়া হাইড্রোলিক হর্ন পরিহার করতে হবে। ইয়ারপ্লাগ ব্যবহার এবং কারখানাগুলোতে সাউন্ডপ্রুফিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

২০১৬ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, সরাসরি এক-তৃতীয়াংশ মানুষ এর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এর মধ্যে কম বা বেশি ক্ষতিও আছে। অর্থাৎ কারও ক্ষতির পরিমাণ বেশি হচ্ছে আবার কারও কম। তবে ক্ষতির শিকার হচ্ছে সবাই।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

বাঙালির ঐতিহ্যে পিঠা

সানজানা রুপা

পিঠা বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি অংশ। এটি শুধু একটি খাবার নয়; এটি আমাদের গ্রামীণ জীবন, ঋতুবৈচিত্র্য, উৎসব এবং সামাজিক বন্ধনের প্রতীক। শীতকাল মানেই যেন মা-দাদিদের হাতের বিভিন্ন স্বাদ ও নকশার পিঠা। আর সেই পিঠার পেছনেও রয়েছে আদি ইতিহাস।

পিঠা শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'পিষ্টক' শব্দ থেকে। আবার পিষ্টক এসেছে 'পিষ্' ক্রিয়ামূলে তৈরি হওয়া শব্দ 'পিষ্ট' থেকে। পিষ্ট অর্থ চূর্ণিত, মর্দিত, দলিত। হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় বঙ্গীয় শব্দকোষ বইয়ে লিখেছেন, পিঠা হলো চাল গুঁড়া, ডাল বাটা, গুড়, নারিকেল ইত্যাদির মিশ্রণে তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ। বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশষ্য ধান। ধান থেকে চাল এবং সেই চালের গুঁড়ো পিঠা তৈরির মূল উপাদান।

আনুমানিক পাঁচশ' বছর আগে থেকে বাঙালি খাদ্যসংস্কৃতিতে পিঠার জনপ্রিয়তার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেহেতু প্রাচীন বইপুস্তকে পিঠার কথা এসেছে, তাই ধরে নেওয়াই যায়, পিঠা খাওয়ার প্রচলন বাঙালি সমাজে অনেক প্রাচীন। শত শত বছর ধরে পিঠা বাঙালির জীবনে আনন্দ, অতিথিপরায়ণতা এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন হিসেবে চলে আসছে। গ্রামবাংলার মাটির ঘ্রাণ, শীতের সকাল এবং নতুন ধানের সৌরভের সঙ্গে পিঠার যে সংযোগ তা আমাদের ঐতিহ্যের একটি অমূল্য দিক।

পিঠা আমাদের ঋতুবৈচিত্র্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ঋতুবৈচিত্র্যপূর্ণ এ দেশে পৌষ মানেই পিঠার মৌসুম। শীতে নতুন ধানের আগমন এবং সে ধান থেকেই তৈরি চালের গুঁড়া দিয়ে পিঠা তৈরি করা হয়। নবান্নের পর জাঁকিয়ে শীত পড়লে পিঠা তৈরির আয়োজন করা হয়। এ সময় খেজুরের রস থেকে গুড় তৈরি করা হয়। সেই গুড় দিয়ে পায়েস এবং নানারকম মিষ্টান্ন তৈরি হয়। খেজুরের রসের মোহনীয় গন্ধে তৈরি পিঠা-পায়েস আরও বেশি মধুময় হয়ে ওঠে।

নতুন ধানের খুশিতে নবান্ন উৎসবে নানা ধরনের পিঠা তৈরি করা হয়। এ উৎসবে পিঠা শুধু খাদ্য নয়, এটি আনন্দ ভাগাভাগির একটি মাধ্যম। পৌষ মাসের পিঠা-পুলির আয়োজন গ্রামের প্রতিটি ঘরে এক ধরনের উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি করে। পিঠা তৈরির সময় পরিবারের সবাই একত্রে কাজ করে, যা পারিবারিক সম্পর্ক মজবুত করে। পিঠা-পায়েসকে

নিয়ে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে এখনো অসংখ্য গান, কবিতা ও ছড়া প্রচলিত আছে। পিঠাকে ঘিরে 'পল্লী মায়ের কোল' কবিতায় বিখ্যাত কবি বেগম সুফিয়া কামাল লিখেছেন, 'পৌষ পার্বণে পিঠা খেতে বসি খুশীতে বিষম খেয়ে/আরও উল্লাস বাড়িয়াছে মনে মায়ের বকুনি পেয়ে।

পিঠা বাঙালির অতিথিপরায়ণতার প্রতীক। বাংলার ঘরে অতিথি আপ্যায়নের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হলো পিঠা। অতিথি এলে ভাপা পিঠা, চিতই পিঠা, পাটিসাপটা বা দুধ চিতই পিঠা দিয়ে আপ্যায়ন করার রীতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। এটি আমাদের ঐতিহ্যের সেই শিক্ষা দেয় যা, অতিথির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করা সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

পিঠার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এর বৈচিত্র্য। বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের পিঠার আলাদা ধরন ও স্বাদ পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের চিতই পিঠা, সিলেটের পাটিসাপটা, রাজশাহীর ফুলঝুরি বা খুলনার ঝিনুক পিঠা প্রতিটির মধ্যেই নিজস্ব বৈচিত্র্য রয়েছে। আমাদের সমাজে হরেক রকম পিঠার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় পিঠা হচ্ছে ভাপা পিঠা। এছাড়াও আছে চিতই পিঠা, দুধচিতই, ছিট পিঠা, দুধকুলি, ক্ষীরকুলি, তিলকুলি, পাটিসাপটা, ফুলঝুড়ি, ধুপি পিঠা, নকশি পিঠা, মালাই পিঠা, মালপোয়া, পাকন পিঠা, ঝাল পিঠা,বিবিখানা পিঠা ইত্যাদি। এলাকাভেদে বাংলাদেশে প্রায় শতাধিক পিঠার প্রচলন রয়েছে।

পিঠায় আঞ্চলিক বৈচিত্র্য আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতিফলন ঘটায়। শুধু দেশি সংস্কৃতিতেই নয়, প্রবাসী বাঙালিদের জীবনেও পিঠা একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। পিঠার স্বাদ গ্রহণ ও জনসমক্ষে একে আরো পরিচিত করে তুলতে দিনব্যাপী অথবা সপ্তাহব্যাপী শহর-নগরে পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি ছাড়াও আরো অনেক সংস্থা ও সংগঠনের উদ্যোগে এ উৎসব উদযাপিত হয়ে থাকে।

বর্তমান সময়ে পিঠা শুধু শীতেই নয়, সারাবছর খাবার সুযোগ রয়েছে। শহুরের ব্যস্ত জীবনে ঘরে ঘরে পিঠা তৈরি না হলেও বেশ কিছু জায়গায় গড়ে উঠেছে পিঠাঘর। যেখানে পিঠা বিক্রি করা হয়। সেখান থেকে পিঠা কিনতেও পাওয়া যায় , আবার বসে খাবার ব্যবস্থাও রয়েছে খাদ্য রসিকদের জন্য। পাশাপাশি গায়ে-হলুদ, জন্মদিন, বিয়ে-শাদীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পিঠা সরবরাহেরও ব্যবস্থা করে থাকে পিঠাঘরগুলো

যদিও আধুনিকতার ছোঁয়ায় অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে, তবু পিঠার ঐতিহ্য এখনও অক্ষুণ্ন আছে। শহুরে জীবনে পিঠা তৈরির সুযোগ কম থাকলেও পিঠা উৎসব এবং ফুড ফেস্টিভালের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে এ ঐতিহ্য তুলে ধরা হচ্ছে। বিশেষত শীতকালে ঢাকার মতো অন্যান্য শহরগুলোয়ও পিঠা উৎসব আয়োজন করা হয়, যা এ ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখার একটি প্রচেষ্টা।

পিঠা আমাদের ঐতিহ্যের অংশ হয়ে উঠেছে কারণ এটি আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে মিশে আছে। এটি আমাদের ইতিহাস, অতিথিপরায়ণতা, ঋতুবৈচিত্র্য এবং পারিবারিক সম্পর্কের প্রতীক। পিঠার এ ঐতিহ্য শুধু অতীতে সীমাবদ্ধ নয়; এটি আজও আমাদের জীবনে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এটি আমাদের সংস্কৃতির একটি মূল্যবান শিক্ষা হয়ে থাকবে।

খেলার সময়ে শেখা

মো. মুনছুর আহমেদ

খেলতে খেলতেই শিশুরা চারপাশকে জানে, উপলব্ধি করে, গুনতে শেখে, বুঝতে শেখে। শিশুর আচরণ, সামাজিক শিক্ষা ও বেড়ে ওঠার পেছনে প্রতিদিনের দলগত বা একক খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। শিশুরা আনন্দের জন্য মাঠে বা পার্কে যায় । পরিবারের সবার নয়নমণি হয়ে বেড়ে উঠতে থাকা একটি শিশু সামাজিক পরিসরে মেশার সুযোগ পায় খেলার মাঠ থেকেই। তাই অন্যের সঙ্গে আচরণ কেমন হওয়া উচিত, তা এখান থেকেই শিখতে শুরু করে শিশু। তাই এক্ষেত্রে অভিভাবকের ভূমিকা এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তবে সব ক্ষেত্রেই শিশুর আচরণ যাতে মার্জিত এবং সুন্দর হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা অভিভাবকের কর্তব্য। এমনই কিছু বিষয় তুলে ধরছি নবারুণ বন্ধুদের জন্য–

খেলার সরঞ্জাম ভাগ করে খেলা

আকর্ষণীয় খেলনাগুলোতে সব শিশুকে সুযোগ দিতে হবে। এগুলো নিজের বাড়ির খেলনা নয়। এতে সবার সমান অধিকার রয়েছে। তাই শিশুকে বুঝাতে হবে, সে যেন কিছুসময় খেলার পর অবশ্যই অন্যদের সুযোগ দেয়। এতে অন্যরা তার উপর খুশি থাকবে। মিলেমিশে খেলার মধ্যেই আসল মজা। আবার নিজের কোনো খেলনা থাকলেও অন্যদের সঙ্গে তা ভাগ করে

খেলতে উৎসাহ দিতে হবে। অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার এই শিক্ষা তার সারা জীবনের পাথেয় হবে।

মিলে মিশে খেলাধুলা

অনেক সময় খেলতে গিয়ে মতের অমিল হতে পারে। খেলাধুলায় হার-জিত থাকবে। এসব নিয়ে তর্কে জড়ানো যাবে না। অতিরিক্ত কিছু করার সময় শিশুকে বুঝাতে হবে। ঝগড়ার মনোভাব থেকে বিরত থাকতে হবে। সবাই ভাবে, নিজেরটা ঠিক, অন্যেরটা ভুল। নিজের কথাটা ঠিক হলেও বন্ধুদের জন্য ছাড় দিতে শেখানো।

সবাই এক রকম হবে না

মাঠে বিভিন্ন পরিবারের শিশুরা আসে খেলতে। সবাই এক রকম হবে না, এটাই স্বাভাবিক। কেউ দ্রুত ছুটবে, কেউ কম ছুটবে। কারও কথায় আঞ্চলিকতার টান থাকবে, এসব নিয়ে হাসাহাসি, কানাকানি করা কিংবা নেতিবাচক মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দিতে হবে। কোনো কিছু নিয়ে অহংকার করা যাবে না। অন্যের খেলনা ধরার আগে অনুমতি নেওয়ার শিক্ষাও দিতে হবে ।

মারামারি থেকে বিরত থাকা

শিশুরা অনেক সময় খালি দোলনায় দোল দেয়। এতে অন্য কারো গায়ে আঘাত লাগছে কি না, তা খেয়াল রাখা প্রয়োজন। দৌড়ঝাঁপ করতে গিয়ে ছোটো শিশুদের কোনো খেলনা ধরা উচিত নয়। এতে তার হাতে লেগে থাকা ময়লায় ছোটো শিশুর ক্ষতি হতে পারে।

এছাড়াও আশপাশে পশুপাখি থাকতে পারে। তাদের ধাওয়া বা বিরক্ত করা যাবে না। পাখির ডিম, পশুপাখির বাচ্চা, ফড়িং, প্রজাপতি, গাছের ডাল প্রভৃতি ধরা কোনো খেলা নয়। এগুলোর ক্ষতি করা যাবে না, শিশুকে সেটা শেখাতে হবে।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস

প্রতিবছর ৩রা ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ১৯৯২ সাল থেকে এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। শারীরিকভাবে অসম্পূর্ণ মানুষদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতা প্রদর্শন ও তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যেই এই দিবসটির সূচনা।

বিশ্বজুড়ে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধিতার শিকার মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও সুরক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি পালিত হয়।

প্রতিবন্ধী দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ, বিকশিত নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে প্রতিবন্ধী জনগণ'। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস আলাদা বাণী দিয়েছেন।

সমাজসেবা অধিদফতরের সর্বশেষ জরিপের তথ্যমতে জানা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা প্রায় ৩৫ লাখ ২১ হাজার ৬০৬ জন। এর মধ্যে ২১ লাখ ৩২ হাজার ৭৮৭ জন পুরুষ, ১৩ লাখ ৮৫ হাজার ৯১১ জন নারী ও ২ হাজার ৯০৮ জন তৃতীয় লিঙ্গের।

সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ ৩৩তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৬তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালনে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে একটি সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিশ্বজুড়ে পালিত এই প্রতিবন্ধী দিবসের পিছনে আছে এক ঘটনাবহুল স্মৃতি। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বেলজিয়ামে এক ভয়াবহ খনি দুর্ঘটনায় বহু মানুষ মারা যান। আহত পাঁচ সহস্রাধিক ব্যক্তি সারা জীবনের জন্য প্রতিবন্ধী হয়ে পড়েন। তাদের প্রতি সহমর্মিতা ও পরহিতপরায়ণ হয়ে বেশ কিছু সামাজিক সংস্থা চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের কাজে এগিয়ে আসে। এর ঠিক পরের বছর জুরিখে বিশ্বের বহু সংগঠন সম্মিলিত ভাবে আন্তর্দেশীয় স্তরে এক বিশাল সম্মেলন করেন। সেখান থেকেই প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে বিস্তারিত সব তথ্যের হদিশ মেলে। সেখানে সর্বসম্মতভাবে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে বেশকিছু প্রস্তাব ও কর্মসূচি পালিত হয়। খনি দুর্ঘটনায় আহত বিপন্ন প্রতিবন্ধীদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন করতে আহ্বান জানানো হয়। সেই থেকেই কালক্রমে সারা পৃথিবীর প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ানোর দিন হয়ে উঠেছে।

প্রতিবেদন: মাহমুদা কামাল

শীতের খেলা ব্যাডমিন্টন

আমাদের দেশে ক্রিকেট ও ফুটবলের জনপ্রিয়তা তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও এদেশের ছেলে বুড়ো সবার কাছে ব্যাডমিন্টন একটি জনপ্রিয় 'মৌসুমী' খেলা। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস এলেই পাড়ার ব্যাডমিন্টন কোর্টগুলো তা জানান দেয় খেলাটির প্রতি তরুণদের আগ্রহের পরিমাপ। শীত এলেই দেশের সকল পাড়া-মহল্লার ছোটো-বড়ো মাঠ, আঙিনা কিংবা ফাঁকা জায়গাগুলোতে হিড়িক পরে যায় ব্যাডমিন্টন খেলার। সারা শীতকাল জুড়ে ব্যাডমিন্টন হয়ে ওঠে বিনোদনের এক অসাধারণ মাধ্যম। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক আলোকিত হয়ে ওঠে ফ্লাডলাইটের আলোয়। শীতের ঠান্ডা আমেজ ভুলে র‍্যাকেট হাতে একত্র হয়ে শাটলের ঠাস ঠাস শব্দে মেতে ওঠে সবাই।

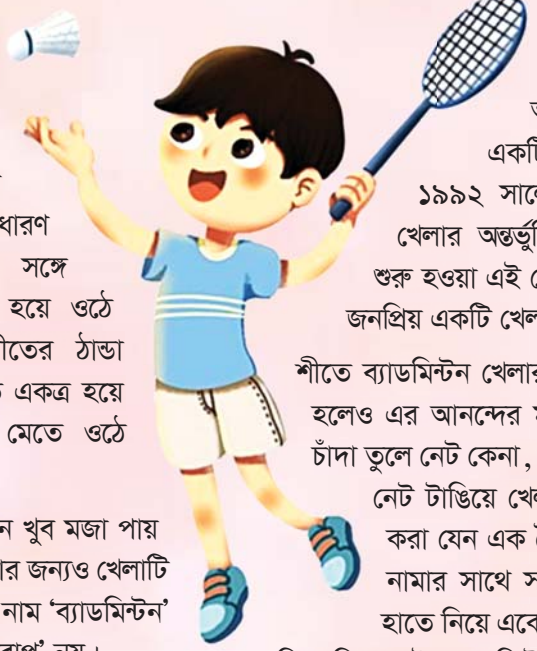

এ খেলাটি খেলে সবাই যেমন খুব মজা পায় তেমনি শরীর-স্বাস্থ্য ফিট রাখার জন্যও খেলাটি বেশ উপকারী। এই খেলার নাম 'ব্যাডমিন্টন' হলেও চর্চাটা 'ব্যাড মানে খারাপ' নয়।

শীতের রাতে ব্যাডমিন্টন খেলা কেবল শরীরচর্চা নয়, এ যেন ঠান্ডার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এক চমৎকার উপায়। একবার র‍্যাকেট হাতে তুলে নিলে আর শীত অনুভূত হয় না। ছোটো-বড়ো, তরুণ-তরুণী কিংবা বয়স্করা সবাই এই খেলায় অংশ নেয়। এ যেন আনন্দ ভাগাভাগি করার এবং সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করার এক অনন্য সুযোগ। যারা খেলায় অংশ নেয় না তারাও দর্শক হয়ে খেলা দেখার আনন্দ উপভোগ করে।

এ খেলার উৎপত্তি ১৮৭৩ সালে ইংল্যান্ডের গ্লুচেস্টারশায়ারের একটি ছোটো গ্রাম 'ব্যাডমিন্টন' থেকে। এই গ্রামের নাম অনুসারেই খেলার নাম রাখা হয় 'ব্যাডমিন্টন'। ধারণা করা হয় ভারতে ব্রিটিশ সেনারা একটি প্রাচীন খেলা 'পুনাই' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এটি ইংল্যান্ডে নিয়ে আসেন। প্রথমদিকে এটি এক ধরনের সামাজিক খেলা হিসেবে জনপ্রিয় ছিল।

পরবর্তীতে ১৮৭৭ সালে ব্যাডমিন্টন খেলার নিয়ম তৈরি করা হয় এবং একই বছর ইংল্যান্ডের বাথ শহরে প্রথম ব্যাডমিন্টন ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন, যা বর্তমানে ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন (BWF) নামে পরিচিত। আধুনিক ব্যাডমিন্টনের একটি বড়ো মাইলফলক হলো ১৯৯২ সালে বার্সেলোনা অলিম্পিকে খেলার অন্তর্ভুক্তি। পাঁচটি ইভেন্ট নিয়ে শুরু হওয়া এই খেলা আজ বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় একটি খেলা।

শীতে ব্যাডমিন্টন খেলার আয়োজন খুব সাদামাটা হলেও এর আনন্দের মাত্রা অসীম। সবাই মিলে চাঁদা তুলে নেট কেনা, ফাঁকা জায়গা নির্বাচন করে নেট টাঙিয়ে খেলার উপযোগী কোর্ট তৈরি করা যেন এক হৈ হৈ কাণ্ড। এরপর সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে র‍্যাকেট, শাটলকক হাতে নিয়ে একের পর এক দল মেতে ওঠে চিরাচরিত এই ব্যাডমিন্টন খেলায়। ফ্লাডলাইটের আলোর নিচে শাটলকক উড়ে বেড়ায় আর র‍্যাকেটের বাড়ি খেয়ে যেন নতুন প্রাণ পায় পুরো পরিবেশ।

শীতের রাতের এই খেলা শরীরকে যেমন চাঙা করে তেমনি মনেও প্রশান্তি আনে। দিনের ক্লান্তি ভুলে সবাই রাতের ব্যাডমিন্টন কোর্টে একত্র হয়। এ যেন এক অনন্য সামাজিক উৎসব। তাই শীতকাল মানেই শুধু লেপের উষ্ণতা নয়, র‍্যাকেট হাতে ব্যাডমিন্টনের উচ্ছ্বাসও।

প্রতিবেদন : রওশন জাহান রত্না

বিবিসির প্রভাবশালী তালিকায় রিক্তা

ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম বিবিসি প্রকাশিত বিশ্বের সবচেয়ে অনুপ্রেরণাদায়ী ও প্রভাবশালী ১০০ নারীর তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন বাংলাদেশের রিক্তা আখতার বানু। ৩রা ডিসেম্বর এ তালিকাটি প্রকাশ করেছে বিবিসি। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করায় এবং প্রতিবন্ধিতার ব্যাপারে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে ভূমিকা রাখায় এ পুরস্কার পেয়েছেন রিক্তা।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিবিসি পৃথক পাঁচ বিভাগে বেছে নিয়েছে বিশ্বের ১০০ নারীকে। বিভাগগুলো হচ্ছে - জলবায়ুকর্মী, সংস্কৃতি ও শিক্ষা, বিনোদন ও ক্রীড়া, রাজনীতি ও অ্যাডভোকেসি এবং বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তি। উল্লেখ্য, এসবের মধ্যে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তি বিভাগে জায়গা করে নিয়েছেন বাংলাদেশের নারী রিক্তা।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের এক প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করেন রিক্তা আখতার বানু। কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জ্যেষ্ঠ নার্স তিনি। ১৯৯৯ সালে রিক্তার কোলজুড়ে আসে এক কন্যা সন্তান। দুর্ভাগ্যক্রমে এ সন্তানটি পরবর্তীতে প্রতিবন্ধীতায় রূপ নেয়। প্রতিবন্ধী কন্যা তানভীন দৃষ্টিমনি (ব্রহ্মপুত্র)। মেয়েকে লেখাপড়া শিখানোর জন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি করলেও প্রতিবন্ধী হওয়ায় তাকে নানারকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। মাত্র তিন বছরের মধ্যে স্কুল কর্তৃপক্ষ তিনবার তানভীনকে প্রতিবন্ধী হওয়ায় পড়াতে অপারগতা প্রকাশ করে। এরপর রিক্তা চেষ্টা করেন মেয়েকে পুনরায় অন্য আরেকটি স্কুলে ভর্তি করতে, কিন্তু বহু অনুরোধ সত্ত্বেও কয়েকদিনের মধ্যেই শিক্ষকরা তাকে আর পড়াতে চাননি।

এই যন্ত্রণা থেকেই রিক্তা আখতার বানু নিজের জমি বিক্রি করে ২০০৯ সালে গড়ে তোলেন রিক্তা আখতার বানু (লুৎফা) বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়। প্রতিবন্ধিতার ব্যাপারে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে তার এই প্রতিষ্ঠানটি। প্রাথমিকভাবে এটি প্রতিবন্ধী বা শেখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে বর্তমানে এটি বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার শিশুশিক্ষার্থীদের সেবা প্রদান করছে। স্কুলটিতে এখন প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে।

প্রসঙ্গত, বিবিসির চলতি বছরের বিশ্বের অনুপ্রেরণাদায়ী ও প্রভাবশালী নারীদের এই তালিকায় জায়গা করে নেয়া অন্যদের মধ্যে রয়েছেন শান্তিতে নোবেলজয়ী নাদিয়া মুরাদ, নভোচারী সুনীতা উইলিয়ামস, ধর্ষণের শিকার হওয়া জিসেস পেলিকট। এছাড়াও রয়েছেন হলিউড অভিনেত্রী শ্যারন স্টোন, অলিম্পিক অ্যাথলেট রেবেকা আন্দ্রাদে ও অ্যালিসন ফেলিঙ, সংগীতশিল্পী রে, ভিজ্যুয়াল অ্যার্টিস্ট ট্রেসি এমিন, জলবায়ুকর্মী আদেনিকে ওলাদোসে, লেখক ক্রিস্টিনা রিভেরা গারজাসহ আরও অনেকে।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

নিউইয়র্কের আকাশে বাংলাদেশের মানচিত্র

বাংলাদেশের মানচিত্র নিউইয়র্কের আকাশে আঁকলেন বাংলাদেশি স্টুডেন্ট পাইলট ফাহিম চৌধুরী। বিজয়ের ৫৩তম বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কের রিপাবলিক বিমানবন্দর থেকে প্লেন উড়িয়ে আকাশে মানচিত্র আঁকেন তিনি। আকাশে গোটা ম্যাপটি তৈরি করতে ফাহিমের উড্ডয়ন করতে হয়েছে ২ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট। এই সময় ধরে তিনি আকাশে বাংলাদেশের মানচিত্রের লাইন বরাবর বিমান চালিয়ে এই কাজটি করেন। তার এই গতিপথ ফ্লাইট রাডারে বাংলাদেশের মানচিত্র হিসেবে ধরা দিয়েছে। ১৪ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের মানচিত্রের রুডম্যাপ তৈরি করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওই বিমানবন্দর থেকে মাঝ আকাশে উড্ডয়ন করেন তিনি। স্থানীয় সময় রাত ১১টা ১৬ মিনিটে উড্ডয়ন করেন আর রাত ১টা ৫৪ মিনিটে ফ্লাইটটি অবতরণ করেন।

ফাহিমের আকাশে আঁকা বাংলাদেশের মানচিত্রটি দ্রুতই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। সেসনা-১৭২ ব্র্যান্ডের এয়ারক্রাফট দিয়ে ফ্লাইটটি পরিচালনা করেন ফাহিম। তিনি বাংলাদেশের গ্যালাক্সি ফ্লাইং অ্যাকাডেমি থেকে প্রাইভেট পাইলট লাইসেন্স অর্জন করেছেন। বর্তমানে কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্সের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণরত আছেন। ফাহিম চৌধুরী গণমাধ্যমকে জানান, বাংলাদেশের বিজয়ের ৫৩ বছর পূর্তিতে একটি বিশেষ কাজ করার চিন্তা থেকেই তিনি এ ম্যাপটি তৈরি করেছেন। ফ্লাইট রাডার ব্যবহার করে মানুষ অনেক ধরনের অদ্ভুত ও সৃজনশীল জিনিস আঁকে, যা দেখে ফাহিম অনুপ্রাণিত হন। যেহেতু আমাদের দেশের ইতিহাস অনেক সংগ্রামী, তাই এ ম্যাপটি তৈরি করতে গিয়ে তিনি চেষ্টা করেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে।

বিশ্বের শীতলতম শহর

শীতকাল কিন্তু অনেকের কাছেই উপভোগ্য একটা সময় তাই না? তবে পৃথিবীতে এমন একটি শহর আছে যেখানে পড়ে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা। রাশিয়ার ইয়াকুতস্ক শহরে যে ঠান্ডা পড়ে, তা সহ্যের বাইরে কারণ, রাশিয়ার ইয়াকুতস্ক এমন একটি শহর, যেখানে চরম ঠান্ডা অনুভূত হয়। তাই ইয়াকুতস্ক বিশ্বের শীতলতম শহর! ২০২৩ সালের ১৮ই জানুয়ারি একটি নতুন রেকর্ড তৈরি হয় ইয়াকুতসকতে। এখানে তাপমাত্রা নেমে গিয়েছিল মাইনাস ৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট-এ (মাইনাস ৬২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস!)। শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসে পানি বরফ হয়। তাহলে ভেবে দেখো বন্ধুরা, মাইনাস ৬২ দশমিক ২ ডিগ্রিতে কী অবস্থা হবে! শহরটি আর্কটিক অঞ্চল (সবচেয়ে শীতলতম অঞ্চল) থেকে ২৮০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

অন্যান্য জায়গার চেয়ে ইয়াকুতস্ক আলাদা। ঠান্ডায় স্থায়ীভাবে জমে গেছে এখানকার মাটি। দুই বছর বা এর বেশি সময় ধরে মাটি জমে থাকলে বলে পারমাফ্রস্ট। এখানকার মাটি সারা বছর ধরে হিমায়িত থাকে। শীতকালে বরফের ঘন কুয়াশায় আবৃত থাকে ইয়াকুতস্ক। পরিবেশ থাকে কুয়াশাচ্ছন্ন। বরফে ছেয়ে যায় সবকিছু। হিমাঙ্কের নিচে থাকা তাপমাত্রায় কীভাবে দিন পার করতে হয়, শীত কীভাবে সহ্য করতে হয়, তা জানে ইয়াকুতস্কের মানুষ। রাস্তায় সারিবদ্ধ গাছ থেকে শুরু করে বাজারে বিক্রি হওয়া মাছ পর্যন্ত এই শহরের সবকিছুই বরফে ঢাকা থাকে। এগুলো ঠান্ডায় এত জমে যায় যে, এগুলো দিয়ে হাতুড়ি হিসেবে কাঠে পেরেক ঠোকা যাবে। ইয়াকুতস্কে শীতকালে বাতাস এত ঠান্ডা যে খোলা জায়গায় থাকলে ত্বককে জমিয়ে ফেলতে পারে। পাঁচ মিনিটের জন্য হাত বের করলে হতে পরে ফ্রস্টবাইট। লোহা বা অ্যালুমিনিয়ামের কোনো কিছু স্পর্শ করলে সেটার সঙ্গে লেগে যায় গায়ের ত্বক। এই শীতল আবহাওয়ার কারণে সাধারণত কেউ ইয়াকুতস্কে বেড়াতে যায় না। তবে কিছু দুঃসাহসী মানুষ আছেন, যারা পৃথিবীর শীতলতম স্থান উপভোগ করতে আসেন এই শহরে।

প্রতিবেদন: ইমদাদ খান

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. যে মাসে বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে, ২. ভাগ্য, ৩. অক্ষর, ৪. প্রতিমাসে যে ভাতা দেওয়া হয়, ৬. অসন্তুষ্ট, ৮. কাঠ বা টিনের তৈরি পানির পাত্র, ১০. গহ্বর, ১২. আকাশগঙ্গা

উপর-নিচ: ১. তীব্র বিস্ফোরক পদার্থ, ২. বিবরণ, ৫. রসুইঘর, ৭. স্বপ্ন, ৯. ইউরোপের একটি দেশ, ১০. রাত্রি, ১১. বসন্তকালীন ফসল

১.				■	২.		
	■	■	■	৩.		■	■
৪.			৫.	■	৬.	৭.	
	■	■		■	■		■
৮.	৯.	■		■	১০.		১১.
■		■		■		■	
■		■	■	■		■	
১২.				■		■	

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৮	*		-	৫	=	
+	■	*	■	-	■	+
	*	২	-		=	৫
-	■	-	■	-	■	+
৩	-		*	২	=	
=	■	=	■	=	■	=
	*	১	-		=	৯

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, নিবেদন, নখদর্পণ, দখল, মালামাল, দামাল, সবজি, মেলা।

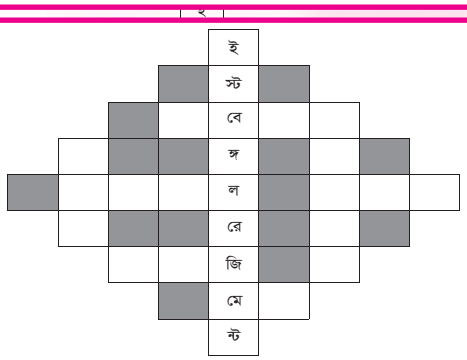

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৫		৩		৬৩		৭৩		৭৫
	৭		৬১		৬৫		৮১	
৯		১		৬৭		৭১		
	১৩		৫৯		৬৯		৭৯	৭৮
১১		১৫		৫৭		৫১		৪৯
	১৯		৫৫		৫৩		৪৭	
২১		১৭		৩৩		৪৫		৪১
	২৫		৩১		৩৫	৪৪	৪৩	
২৩		২৭		২৯		৩৭		৩৯

নভেম্বর মাসের সমাধান

শব্দধাঁধা

ডি	সে	ম্ব	র	■	ব	রা	ত
না	■	■	■	ব	র্ণ	■	■
মা	সো	য়া	রা	■	না	খো	শ
ই	■	■	ন্না	■	■	য়া	■
ট	ব	■	ঘ	■	বি	ব	র
■	স	■	র	■	ভা	■	বি
■	নি	■	■	■	ব	■	শ
ছা	য়া	প	থ	■	রী	■	স্য

ছক মিলাও

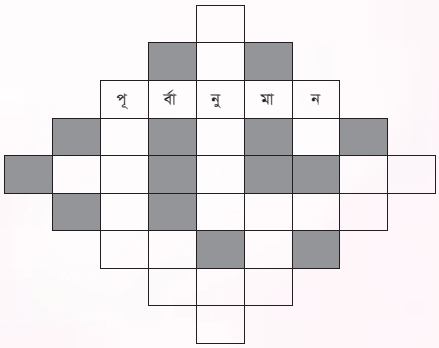

ব্রেইন ইকুয়েশন

৮	*	১	-	৫	=	৩
+	■	*	■	-	■	+
৪	*	২	-	৩	=	৫
-	■	-	■	-	■	+
৩	-	১	*	২	=	১
=	■	=	■	=	■	=
৯	*	১	-	০	=	৯

নাম্ব্রিক্স

৫	৪	৩	৬২	৬৩	৬৪	৭৩	৭৪	৭৫
৬	৭	২	৬১	৬৬	৬৫	৭২	৮১	৭৬
৯	৮	১	৬০	৬৭	৬৮	৭১	৮০	৭৭
১০	১৩	১৪	৫৯	৫৮	৬৯	৭০	৭৯	৭৮
১১	১২	১৫	৫৬	৫৭	৫২	৫১	৫০	৪৯
২০	১৯	১৬	৫৫	৫৪	৫৩	৪৬	৪৭	৪৮
২১	১৮	১৭	৩২	৩৩	৩৪	৪৫	৪২	৪১
২২	২৫	২৬	৩১	৩০	৩৫	৪৪	৪৩	৪০
২৩	২৪	২৭	২৮	২৯	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯

আলভিনা চৌধুরী, তৃতীয় শ্রেণি, ম্যাপল লীফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা

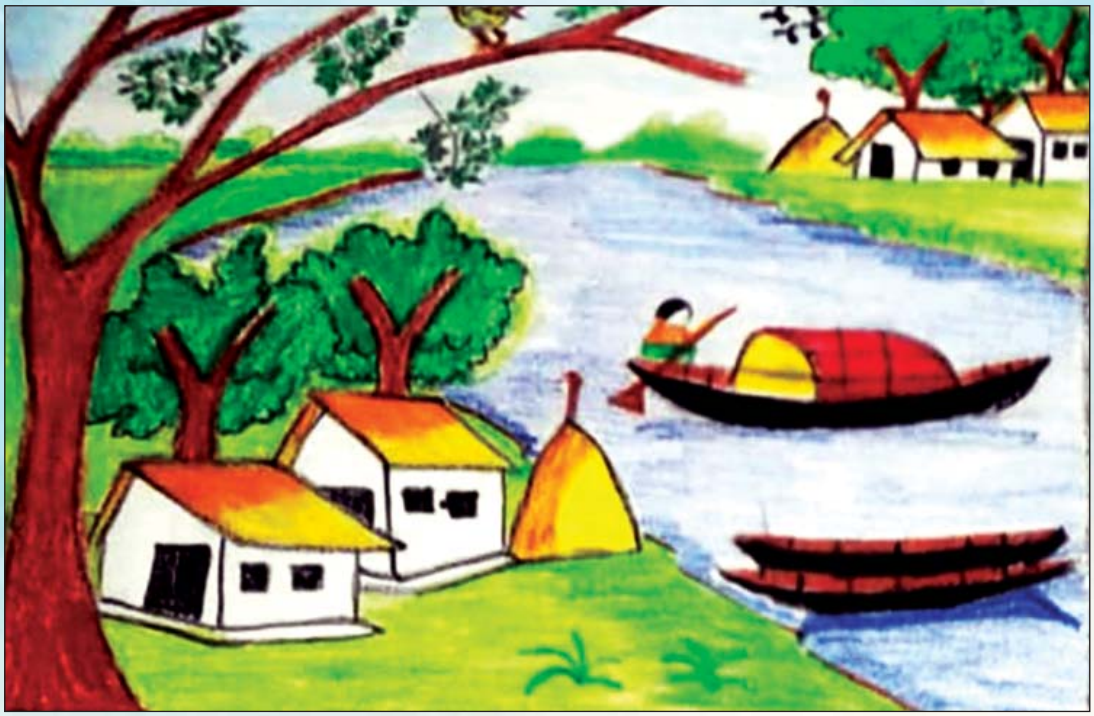

তাহমিনা আলম, পঞ্চম শ্রেণি প্যারাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চাঁদপুর

তাছনিম আক্তার শিফা, নবম শ্রেণি, কাজকামতা আশ্রাফিয়া আলিম মাদ্রাসা, কুমিল্লা

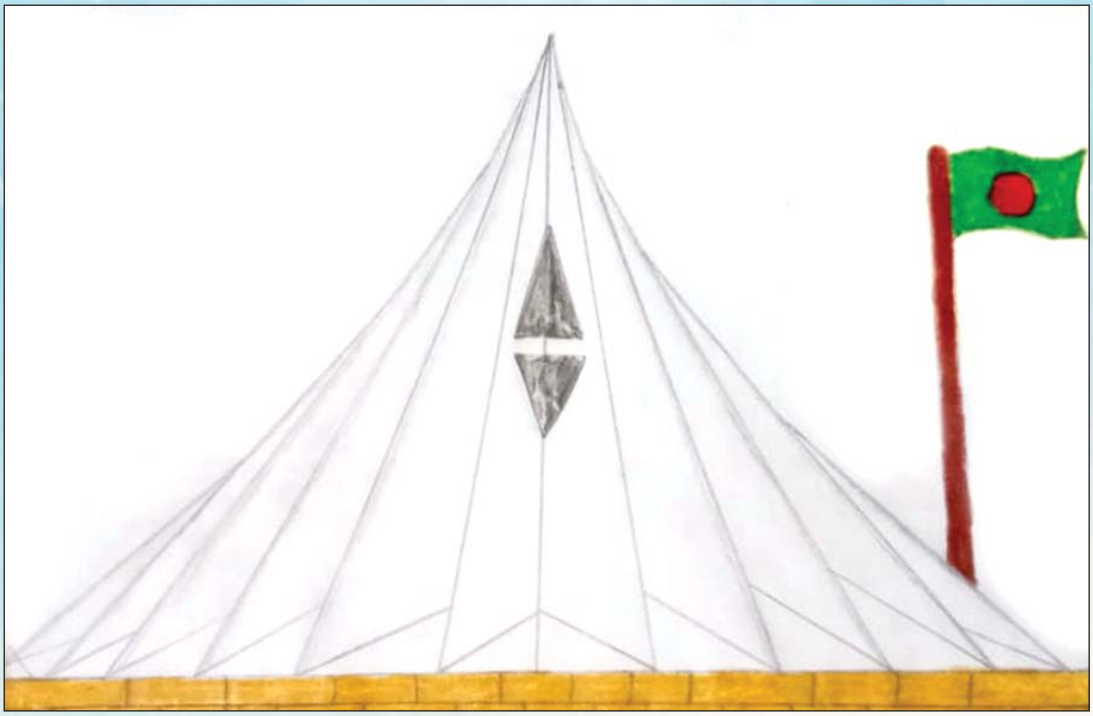

আরিশা হক, প্রথম শ্রেণি, আল ইহসান মাদ্রাসা, মুগদা, ঢাকা

লায়লা আক্তার, নবম শ্রেণি, মুকসুদপুর উচ্চ বিদ্যালয়, দোহার, ঢাকা

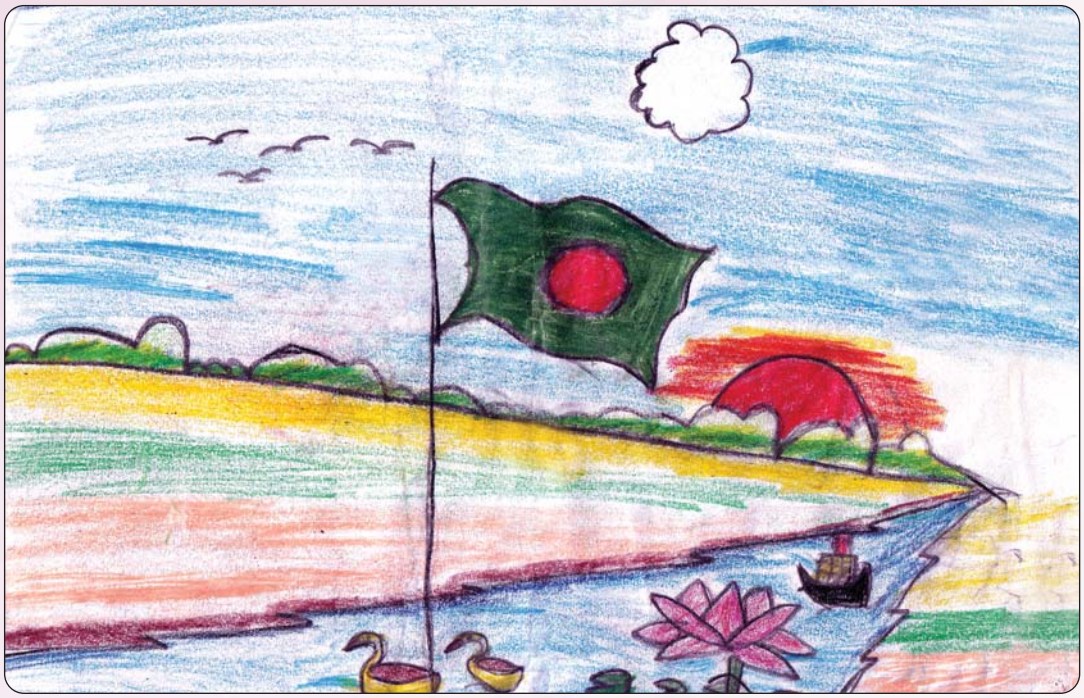

মৃন্ময়ী দে, দ্বিতীয় শ্রেণি, নবগঙ্গা ন্যাশনাল একাডেমি, ঝিনাইদহ সদর

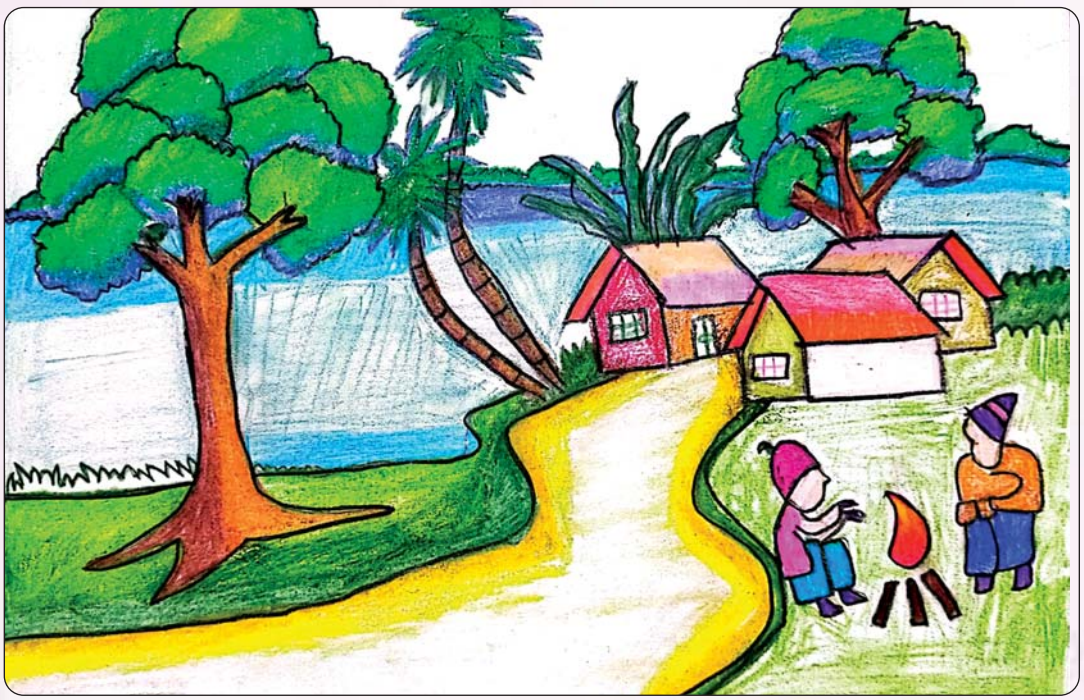

জেসিকা জেবিন, পঞ্চম শ্রেণি, নোয়াদিয়া খৈশাখালী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নরসিংদী

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-49, No-06. December 2024, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

অনিন্দ্য ঘোষ, তৃতীয় শ্রেণি, উইলস্ লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা